চিঠিপত্র

চিঠিপত্র ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ২। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত
চিঠিপত্র ৩। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৪। কন্যা মাধুরীলতা দেবী, মীরা দেবী, দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দৌহিত্রী নন্দিতা ও পৌত্রী নন্দিনী দেবীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথনাথ চৌধুরীকে লিখিত
চিঠিপত্র ৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত
চিঠিপত্র ৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত
চিঠিপত্র ৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ৯। হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁর পুত্র, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা ও দৌহিত্রীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১০। দীনেশচন্দ্র সেন এবং তাঁর পুত্র অরুণচন্দ্র সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ১১। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর মাতা অনিন্দিতা দেবী এবং অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১২। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারবর্গকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৩। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী জ্যোৎস্নিকা দেবী, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৫। যদুনাথ সরকার ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৬। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সমর সেনকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৭। দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও নীরা চৌধুরীকে লিখিত
চিঠিপত্র ১৮। রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়), ফণিভূষণ অধিকারী, সরযূবালা অধিকারী, যাদুমতি মুখোপাধ্যায়, আশা অধিকারী ও ভক্তি অধিকারীকে লিখিত।
চিঠিপত্র ১৯। সজনীকান্ত দাস, সুধারানী দাসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ও উমারানী দাসকে লিখিত অটোগ্রাফ-কবিতা

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরাদেবীকে লিখিত
ছিন্নপত্রাবলী। ইন্দিরাদেবীকে লিখিত, পত্রাবলীর পূর্ণতর সংস্করণ
পথে ও পথের প্রান্তে। নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত
ভানুসিংহের পত্রাবলী। রাণু দেবীকে লিখিত

ঊনবিংশ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
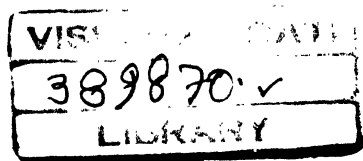
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলকাতা

চিঠিপত্র॥ ঊনবিংশ খণ্ড

সজনীকান্ত দাস, সুধারানী দাসকে
লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী ও
উমারানী দাসকে লিখিত অটোগ্রাফ-কবিতা

প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৪১১

সংকলন ও সম্পাদনা : শ্রীমতী সাগর মিত্র

ISBN-81-7522-377-4 (V. 19)
ISBN-81-7522-025-2 (Set)

প্রকাশক। অধ্যাপক সুধেন্দু মণ্ডল
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

অক্ষর বিন্যাস। অ্যাস্ট্রাগ্রাফিয়া
৪০বি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট। কলকাতা ১২

মুদ্রক। অ্যাস্ট্রাগ্রাফিয়া
৪০বি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট। কলকাতা ১২

প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত প্রসঙ্গ, বহুকাল অতিবাহিত হয়ে, আজও বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়।

ব্যঙ্গ-সুনিপুণ সমালোচক সম্পাদক হিসেবে সজনীকান্ত দাস বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। শৈশব থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে রবীন্দ্রভক্ত। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে জীবনের কোনো কাজই সম্পূর্ণ হত না সজনীকান্তের।

কিন্তু একসময় সজনীকান্ত ও 'শনিবারের চিঠি'র গোষ্ঠী রবীন্দ্র-বিদূষণে শালীনতার সমস্ত সীমারেখা লঙ্ঘন করেছিলেন। এতে রবীন্দ্রনাথ মর্মান্তিক ভাবে আহত হন।

জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়ে অপরিসীম স্নেহবশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই 'রাবণ-ভক্ত'টির চিত্ত জয় করেছিলেন। জীবনের শেষ তিন বছর গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা অকৃত্রিম আন্তরিকতায় হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল।

গুরু-শিষ্যের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উত্থান-পতনের ইতিহাস উন্মোচন করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের পত্রসমূহ পূর্বে দুটি গ্রন্থে এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিচ্ছিন্নভাবে মুদ্রিত দুই পক্ষের এই-সব চিঠিপত্রের পূর্ণাঙ্গরূপ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিবরণসহ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বইটি প্রকাশে রবীন্দ্র-অনুরাগী ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক এবং আগ্রহী পাঠকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'চিঠিপত্র' পর্যায়ভুক্ত বর্তমান খণ্ডটি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন সজনীকান্ত দৌহিত্রী শ্রীমতী সাগর মিত্র। গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীসুধেন্দু মণ্ডল ও কর্মীদের তৎপরতায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হল।

শান্তিনিকেতন
১৭ বৈশাখ ১৪১১

শ্রীসুজিতকুমার বসু
উপাচার্য। বিশ্বভারতী

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

সজনীকান্ত দাসকে লিখিত
রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

১
৪ মার্চ ১৯২২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

গোরার কোন্ জায়গা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছ[১] মনে পড়িতেছে না, বইখানিও হাতের কাছে নাই। যদি মধ্যাহ্ন কালের বর্ণনা হয় তবে ছায়ার দীর্ঘতা অসম্ভব বটে, যদি মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইয়া থাকে তবে ছায়া দীর্ঘ হওয়ার বাধা নাই বিশেষত ঋতুবিশেষে।

তোমার কবিতাটি[২] পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২
৯ মার্চ ১৯২৭

SANTINIKETAN
BENGAL, INDIA

কল্যাণীয়েষু

কঠিন আঘাতে একটা আঙুল সম্প্রতি পঙ্গু হওয়াতে লেখা সহজে সরচে না। ফলে বাক্সংযম স্বতঃসিদ্ধ।

আধুনিক সাহিত্য[১] আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখ্তে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে আছে। আমি সেটাকে

সুশ্রী বলি এমন ভুল করো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এস্থলে গ্রাহ্য না হ'তেও পারে। আলোচনা কর্‌তে হ'লে সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব[২] নিয়ে পড়তে হবে এখন মনটা ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত, পাপগ্রহের বক্রদৃষ্টির প্রভাব প্রবল—তাই এখন বাগ্‌বাত্যার ধূলো দিগ্‌দিগন্তে ছড়াবার সখ একটুও নেই। সুসময় যদি আসে তখন আমার যা বল্‌বার বল্‌ব। ইতি ২৫ ফাল্গুন, ১৩৩৩

শুভকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩
১৪ নভেম্বর ১৯২৭

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার বিদ্রূপের প্রখর অগ্নিবাণে বড় বড় মহামহোপাধ্যায়ের পণ্ড পাণ্ডিত্যের বর্মচ্ছেদন যখন করো তখন তার মধ্যে একটা মহাকাব্যিক মহিমা দেখতে পাই— তাতে খুশি হই— কিন্তু তোমাদের 'শনিবারের চিঠি'র সমরাঙ্গণে আহতদের মধ্যে কোনো নারীকে ধরাশায়িনী[১] দেখলে আমার মন অত্যন্ত কুণ্ঠিত না হয়ে থাকতে পারে না— তারা অপরাধিনী হ'লেও। নারীদের প্রতি পুরুষস্বভাবের অন্তর্গূঢ় করুণাই তার একমাত্র কারণ নয়— আরো একটা কারণ আছে। তোমাদের হাতে মার খেয়ে অর্থনীতির অধ্যাপকের যে লজ্জা সেটা সাহিত্যিক লজ্জা, —কিন্তু মেয়েদের লজ্জা তার উপরে আরো বেশি, সেটা সামাজিক।

সিভিল, ক্রিমিন্যাল দুই আদালতেই তাদের দণ্ড। শাস্তির পরিমাণে এই যে অসাম্য এতে আমাকে বাজে। তার পরে ভেবে দেখো, বৈদিক মন্ত্রে বলেচে "ছায়েবানুগতা", ওরা যদি দোষ করে থাকে তবে সেটা পুরুষের অনুবর্তী হয়ে। এ স্থলে স্থূল বস্তুটাকে আঘাত ক'রে যদি পেড়ে ফেলতে পারো তা হ'লে ছায়ার টিকি দেখা যাবে না। অনেক সময় স্থূল বস্তুর চেয়ে ছায়াকে দীর্ঘতর দেখতে হয়— মেয়েদের অপরাধ তেমনি পরিমাণে বেশি বড়ো ব'লে মনে হয়, কিন্তু তবুও সেটা ছায়া। সহধর্ম্মিণীর সহধর্ম্মিতার জন্যে দোষ দিয়ে কি হবে, আগে আগে যে দুঃসহধর্ম্মীটা চলে, চেপে ধরো তাকে। তোমাদের শনির সম্বন্ধে রবির এই বক্তব্যটা চিন্তা করে দেখো। ইতি ২৮শে কার্তিক ১৩৩৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪
১৯ নভেম্বর ১৯২৭

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

দোহাই তোমাদের, 'শনিবারের চিঠি'তে আমাকে টেনো না।[১] নিজে যদি সাহিত্যিক না হতুম তাহ'লে তোমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষায় রাজি হতুম— কেন না আমার পক্ষে এটা ক্যানিবলিজ্‌ম দাঁড়ায়। 'প্রবাসী'তে এবার যেটা লিখেচি[২] সেটাতেও হয়তো অনেকের গায়ে বাজবে— কারণ গায়ের শিরগুলো অনেকেরই টন্‌টনে হয়ে রয়েচে। যৌবনের

তীব্রতা গিয়ে অবধি আমার কলম প্রায় জৈনমতে চলতে চায়, এখন সময় অল্প বলেই সেই সঙ্কীর্ণ সময়টার গায়ে রক্তের দাগ লাগাতে সঙ্কোচ হয়— ধুয়ে ফেলবার অবকাশ পাব না। অল্প কটা দিন আছে —শেষ ব্যবহারের জন্যে স্বচ্ছ রাখতে ইচ্ছা করে। তোমার হল সার্জিকাল ডিপার্টমেণ্ট, আর আমার আরোগ্য-স্নানের মহল। তোমার বয়স যদি পেতুম তোমার ব্রতে যোগ দেওয়া সহজ হ'ত। ইতি ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫
১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭

[6 Dwarkanath Tagore Lane
Calcutta]

কল্যাণীয়েষু

আত্মশক্তিতে[১] কয়েক সংখ্যা ধরে নটরাজের যে সুদীর্ঘ নিন্দাবাদ[২] প্রকাশ হয়েছিল সেটা তোমার লেখা বলে আমি জানতুম না বা সন্দেহ করি নি। বাইরে থেকে চিঠি পাই। তার উত্তরে লিখি, যাঁদের আমি বন্ধু বলে বিশ্বাস করি তাঁরা আমার নিন্দাপ্রচারে আনন্দ বোধ করেন এত বার বার ইহার প্রমাণ পাইয়াছি [য] যে ইহাতে আমি বিস্মিত হই না এবং একথা লইয়া আলোচনা করিতে আমার লেশমাত্র ইচ্ছা নাই।

নিঃসন্দেহ আমার দীর্ঘকালের কাব্যরচনায় মন্দ-লেখা বিস্তর আছে। সেইগুলির উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়া ইতিপূর্ব্বে তুমি কখনো লেখ নাই। সম্প্রতি যদি আমার কোনো লেখা মন্দ হইয়া থাকে সেটা কি পাঁচখানা কাগজে ভরাইবার মতো এতই অসহ্য মন্দ? এ সম্বন্ধে তোমার মত যদি আমাকে লিখিয়া জানাইতে, আমার কৈফিয়ৎ আত্মীয়ভাবে তোমাকে জানাইতে পারিতাম। কিন্তু আত্মশক্তিতে তোমার সহিত পাল্লা দিতে পারি না, সে কথা তুমি জানো এবং মোহিত মজুমদারের[৩] তাহা জানা আছে। এমন অবস্থায় ছাপার কাগজের উচ্চাসনে গুপ্তভাবে বসিয়া আমার প্রতি সরাসরি বিচারে যথেচ্ছ দণ্ড বিধান করা তোমাদের পক্ষে সহজ কিন্তু এমন কাজ তুমি করিতে পারো তাহা সন্দেহ করা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।

মেঘনাদবধের সমালোচনা[৪] যখন লিখিয়াছিলাম তখন আমার বয়স ১৫। তাছাড়া তখন মাইকেলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল না। বঙ্কিম ও মহাত্মাজির সঙ্গে আমার যে দ্বন্দ্ব তাহা নৈতিক, তাহা কর্ত্তব্যের বিশেষ প্ররোচনায়। বঙ্কিমের কোনো গ্রন্থের সাহিত্যিক সমালোচনা যদি করিতাম তবে প্রধান ঝোঁক দিতাম তাঁহার গুণের উপর, ত্রুটির উপর নহে, কারণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। শ্রদ্ধাই পজিটিভ গুণকে বড় করিয়া দেখে। এইজন্যেই রাজসিংহের সমালোচনা করিয়াছিলাম।[৫]

এতকথা লিখিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তুমি তোমার কথা জানাইয়াছ বলিয়াই লিখিতে হইল। ইতি ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮

Santiniketan, Feb. 13, 1928

I know Babu Sajanikanta Das and I can certify that he is an author whose mastery of Bengali language and knowledge of our literature is remarkable.

Rabindranath Tagore

৭
৪ মার্চ ১৯২৮

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

চেষ্টা করব কিন্তু কি রকম ব্যস্ত হয়ে আছি তা তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না। এর ওপরে হিবর্ট লেকচার[১] এখনো লিখতে বসতে পারি নি ব'লে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছে।

তর্ক-বিতর্কের যে ঘোরতর আন্দোলন চলচে[২] তাতে আরো ঠেলা মারতে ইচ্ছে করে না। আমাকে তো সবাই মিলে বরখাস্ত ক'রে দিয়েচে, যদি না জানতুম যে তরুণেরা চতুর্ম্মুখের মুখোষ প'রে আমাকে ভয় দেখাচ্চে তা হ'লে তো মুখ শুকিয়ে যেত। কিন্তু এদের এই সমস্ত পিতামহগিরি নিয়ে যে পেট-ভরে হাসব তারো সময় আমার নেই— চতুর্ম্মুখ বোধ হয় এই সমস্ত নকল বিধাতাদের উদ্দাম ভঙ্গী

দেখে স্বয়ং হাসচেন, তাঁর কাছে তো অগোচর নেই এদের আয়ু [আয়ু] কতদিনের। ইতি ২০ ফাল্গুন ১৩৩৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত এই পত্রের একটি নকল রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্ত দাসকে পাঠিয়েছিলেন।

৮
২৬ ডিসেম্বর ১৯২৯

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মনে করেছিলুম তোমার খাতা থেকে আমার ছবিটাকে নির্বাসিত করব।[১] তুমি রক্ষা করতে অনুরোধ করচ, রইল ওটা।

সেদিন তোমার সঙ্গে যে কথার আলোচনা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আরো কয়েকটা কথা এইখানে বলে রাখি। তুমি বলেছিলে শনিবারের চিঠিতে যাঁরা আমার অবমাননা করেচেন তাঁরা আমার ভক্ত, কেবল বিশেষ কোনো ব্যক্তিগত কারণেই তাঁরা আমাকে আক্রমণ করে ক্ষোভ নিবৃত্তি করেচেন। কিছুকাল থেকেই এটা দেখেচি ব্যক্তিগত কারণ ঘটবার পূর্ব হতেই তাঁরা আমার নিন্দায় আনন্দ ভোগ করে এসেচেন। এটা দেখেচি যাঁরা কোনো দিন আমার লেখার কোনো গুণ ব্যাখ্যা করবার জন্যে একছত্রও লেখেন নি তাঁরাই নিন্দা করবার বেলাতেই অজস্র ভাবে বহু পল্লবিত করে লিখেচেন। সকল লেখকের রচনাতেই

ভালোমন্দ দুইই থাকে কিন্তু ভালোটার সম্বন্ধে নীরব থেকে মন্দটাকেই দীর্ঘস্বরে ঘোষণা করার উৎসাহ শ্রদ্ধার লক্ষণ নয়। মোটের উপর যাকে আমরা নিন্দার্হ বলে জানি তার সম্বন্ধেই এরকম আগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু তবু এরকম ব্যবহারকে নিন্দা করা যায় না। কেন না সকলেই আমার রচনা বা চরিত্রকে প্রশংসনীয় বলে মনে করবে এরকম প্রত্যাশা করাও লজ্জার কথা। বাংলাদেশে আমার সম্বন্ধে এমন প্রত্যাশা করার হেতুই ঘটে নি। এঁরা কথায় কথায় খোঁটা দিয়ে থাকেন যে স্তাবকবৃন্দ আমাকে বেষ্টন করে সর্বদা যে স্তব-কোলাহল করে থাকেন তার দ্বারাই নিজের ত্রুটিবিচারে আমি অক্ষম। এঁরা নিজে আমাকে পরিবেষ্টন করে থাকেন না, যাঁরা থাকেন তাঁরা কী করেন সে সম্বন্ধে এঁদের অনভিজ্ঞ কল্পনা আমার প্রতি প্রতিকূল মনোভাবের পরিচয় দেয়। কিছুকাল ধরে তুমি নিরন্তর আমার কাছে ছিলে, নিজের স্তব শোনবার আকাঙ্ক্ষা ও অভ্যাস তোমার দ্বারা পরিতৃপ্ত করবার কোনো চেষ্টা করেচি কিনা তার সাক্ষ্য তুমিই দিতে পারো। আমার যতদূর মনে পড়ে যেখানে তোমার কোনো গুণ দেখেচি সেখানে তোমার গোচরে ও অগোচরে তোমার স্তব আমিই করেচি। আমার বক্তব্য এই যে অসঙ্কোচে যাঁরা আমার নিন্দা করতে আনন্দ পান তাঁদের সংখ্যা অনেক এবং আমি তাঁদের দোষ দেব না, কিন্তু তাঁরা আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান একথা বলা চলবে না।

সময় এসেচে যখন এসব ব্যাপারকে শান্তভাবে আমাকে গ্রহণ করতে হবে। দেশের লোকের কাছ থেকে আমি যা পাই তা আমার প্রাপ্য নয় এবং যা না পাই তাই আমার প্রাপ্য এই হিসেবনিকেশের নালিশ তুলে কিছু লাভ হয় না। মানরক্ষাও হয় না। কিন্তু অনাত্মভাবে সত্যটাকে জেনে রাখা দরকার। চিত্তরঞ্জন কিংবা মহাত্মাজিকে দেশের লোকে কদাচিৎ প্রতিবাদ করেচে, এমন কি নিন্দাও করেচে কিন্তু অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের কাছ থেকে আঘাত পেয়েও গর্হিত

ভাষায় কুৎসিত ভাবে তাঁদের প্রতি অসম্মান করেননি— করতে পারলে আনন্দ পেতেন না তাও নয় কিন্তু সাহস করেন নি— কারণ তাঁরা জানেন দেশের লোক তা সহ্য করবে না। আমার সম্বন্ধে সে রকম সঙ্কোচের লেশমাত্র কারণ নেই— অনেকেই আমার নিন্দায় প্রীত হন এবং বাকি অধিকাংশই সম্পূর্ণ উদাসীন। আমার প্রকাশ্য অপমানে দেশের লোকের চিত্তে বেদনা লাগে না, সুতরাং আমার প্রতি যাঁরা কুৎসা প্রয়োগ করেন তাঁদের ক্ষতি বিপদ বা তিরস্কারের আশঙ্কা নেই। এক হিসাবে তাঁরা সমস্ত দেশের প্রতিনিধি-স্বরূপেই এ কাজ করে থাকেন। সুতরাং তারা উপলক্ষ্য মাত্র। যাঁরা আমার অন্ধ স্তাবক বলে কল্পিত, যাঁরা আমার সুহৃদ বলে গণ্য তাঁরা আমার এই অবমাননার কোনো প্রকাশ্য প্রতিকার করে থাকেন তারও কোনো প্রমাণ নেই। বুঝতে পারি প্রকাশ্যে অপমান করতে অপর পক্ষের যত সাহস ও নৈপুণ্য এ পক্ষের তা নেই, তার প্রধান কারণ তাঁরা মনে মনে জানেন দেশের লোকের সহযোগিতার বল তাঁদের দিকে নয়। দেশের লোকের কাছে যে কোনো কারণে যাঁরা শ্রদ্ধাভাজন তাঁদের ভাগ্যে এরকম গ্লানি কোনো দেশে কখনোই ঘটে না— রাস্তার চৌমাথার মধ্যে এমন নির্যাতন নিঃসহায়ভাবে তাঁদের কখনোই ভোগ করতে হয় না। তাই বলচি এই ব্যাপারের মূল সত্যটাকে আমার জেনে নেওয়া এবং মেনে নেওয়া দরকার— আর তার পরে চিত্তকে অবিচলিত রাখা আরো দরকার। সত্তরের কাছে এসে পৌঁছেচি —আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেচে, এখন মনের সমস্ত শক্তি নিয়ে এই কামনা করচি যে এই হতভাগ্য আমি নামক বাহিরের পদার্থটার সমস্ত বোঝা এবং লাঞ্ছনা থেকে ভিতরের আমি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যেন ইহলোক থেকে বিদায় নিতে পারে।

এই উপলক্ষ্যে সংক্ষেপে আর একটা কথা বলে রাখি। প্রকাশ করাই অ মার স্বধর্ম— প্রকাশের প্রেরণাকে অবরুদ্ধ করা আমার পক্ষে

ধর্মবিরুদ্ধ। আমার প্রকৃতিতে এই প্রকাশের নানা ধারার উৎস আছে —তাদের যেটাকেই আমি অগ্রাহ্য করব সেটাতেই আমার খর্বতা ঘটবে। প্রকাশ আর ভোগ এক জিনিস নয়— প্রকাশের অভিমুখিতা বাইরের দিকে, বস্তুত সেটাতেই তার অবরোধ। আমার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে তোমার মনে আপত্তি উঠেচে ?[2] কিন্তু নাটক রচনার মধ্যে যে প্রকাশ-চেষ্টা, অভিনয়ের মধ্যেও তাই। রচনার মধ্যেই যদি কলুষ থাকে সেটা নিন্দনীয়, অভিনয়ের মধ্যে যদি থাকে সেও নিন্দনীয়— কিন্তু অভিনয় ব্যাপারের মধ্যেই আত্মলাঘবতা আছে এ কথা আমি জানি নে। আমার মধ্যে সৃষ্টিমুখী যতগুলো উদ্যম আছে তার প্রত্যেকটাকেই স্বীকার করতে আমি বাধ্য। তোমাদের অভ্যাস ও সংস্কারের বাধায় তোমরা যে দোষ কল্পনা করচ তার দ্বারা আমার চেষ্টাকে প্রতিরুদ্ধ করলে নিজের প্রতি গুরুতর অন্যায় করা হবে। ইতি ১১ই পৌষ, ১৩৩৬ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিয়োগ পত্র

৯
২৫ জুলাই ১৯৩৮

6, Dwarkanath Tagore Lane
Calcutta

I hereby appoint a Board consisting of Sjs. Sajanikanta Das, Hiron Kumar Sanyal, Nanda Gopal Sen Gupta, and

Kishori Mohan Santra with Sj. Charu Chandra Bhattacharjee as secretary to advise me in the selection of poems for the revised second edition of "বাংলা কাব্যপরিচয়".[১] I hope they will kindly accept the office.

25.7.38 Rabindranath Tagore

১০
৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

ভুলেই গিয়েছিলুম।[১] তোমার চিঠি পেয়ে আজ আমি কয়েক লাইন লিখে মেদিনীপুরে কালেক্টরকে[২] পাঠিয়ে দিয়েছি। মুক্তির উপায়[৩] থেকে বোধ হচ্চে আমার মুক্তির উপায় নেই। আচ্ছা কপি করিয়ে পাঠিয়ে দেব। সুধাকান্ত রায় চৌধুরী[৪] বলচে পালিশ করে দেওয়া দরকার। আমার মন বলচে আর তো পারা যায় না। যারা জন্মায় কুঁড়ে হয়ে তারা মরে খাটতে খাটতে। ইতি ৬/৯/৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১
১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

আমার দোষ নেই। কপি করিয়ে ঠিক করে রেখেছিলুম লেখাটা[১] —যাঁরা আমার পারিমণ্ডল, তাঁরা আরও কপি করানো কর্তব্য বোধ করলেন— যাঁরা কপি করেন তাঁরাও ক্ষিপ্রকারিতার জন্য বিখ্যাত নন। রেজেস্ট্রি ডাকে কাল রওনা হয়ে গেছে বলে অনুমান করি। লেখাটার মধ্যে সকলের চেয়ে ব্যবহার্য হচ্ছে আমার দস্তখৎ— সেইটের ছাপ দেখিয়ে ডুবো মাল যদি তোমরা চালাও বাজারে, তবে তার দায় তোমরা কবুল কোরো সাধারণের দরবারে।

ভূমিকায় পুষ্পমালার উপরে অগুরুবনদাহনের ব্রত আরোপ করেছি— সে অংশ তুলে দিয়ো[২]— লোকে ভাববে বইটা প্রপাগ্যাণ্ডা— সেটা সত্য নয়। এটা বিশুদ্ধ উচ্চহাস্য।

কাব্যপরিচয়ের পরিমার্জিত রূপের[৩] জন্যে অপেক্ষা করে আছি। দ্বিতীয় খণ্ডে আদিরসের বাহনটিকেও প্রয়োজন আছে। দিলীপকুমার[৪] তাঁর কবিতার নির্বাচনে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, আমি তাঁকে জানিয়েছি দ্বিতীয় সংস্করণের দায়িত্ব আমি নেব না। তোমার নাম করি নি তাহলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। ইতি ১৫/৯/৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২
২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

দুখণ্ড অলকা[১] পেয়েছি। বিতরণ হয়ে গেছে। এখন ছুটির সময় আর পাঠাতে হবে না। যদি কোনো কারণে পরে দরকার হয় জানাব। আশাকরি তোমার পাঠকদের মেজাজ বিগড়িয়ে যায়নি।

কাব্যসঙ্কলন উপলক্ষ্যে বুদ্ধদেব[২] উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তাকে ঠাণ্ডা করতে পার তো কোরো। এই বইয়ে সমর সেনের[৩] বিরহ তাকে বেজেছে। দিলীপ[৪] দুঃখিত। সুধীন্দ্র[৫] ক্ষাপা। তাদের কবিতা তাদের দিয়েই বাছাই করতে দেওয়া চলে কিনা ভেবে দেখো। ইতি ২৮/৯/৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩
৭ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

আমি পলাতকা। চলেছি পাহাড়ের দিকে। স্বভাব সঙ্গত অভ্যাসে ভুল করেছি— উল্টা বুঝেছি— গরম যখন দুঃসহ ছিল তখন শীতের সন্ধানে বেরব বলে মন স্থির করতে করতে ভাদ্দুরে গরমের ফ্রন্টিয়ারে এসে পড়েছি। আয়োজনটা যখন পাকা হয়েছে প্রয়োজনটা তখন পরিহাস করতে উদ্যত, কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে মন বদলাতে গেলে পরিচিত বর্গের পক্ষে সেটা কৌতুকজনক হবে জেনে দৃঢ়তার সঙ্গে জেদ বজায় রাখ্‌তে হোলো। কাল যাব কলকাতায় সোমবারে যাব কালিম্পঙ।[১]

কাব্যসাহিত্যকে আমি ইতিহাসের গণ্ডি দিতে চাইনি— আমার ও বুদ্ধি নেই। কবিতা যদি যেমন তেমন করে আসন নেয়, তাতে তার রসের ক্ষতি বা মর্যাদার হানি হয় না। ওদিকে আমি চিন্তাই করিনি। এর থেকে বুঝবে আমার সঙ্কলনকর্মের অযোগ্যতা। কোনো কোনো কবি ফরমাস করেছেন এবারে যেন আমি ভালো কবিতা বাছাই করি অর্থাৎ তাঁদের মতের অনুসরণ করি। মত কি তা জানার সম্ভাবনা নেই, থাকলেও হয় তো মানার সম্ভাবনা আরো দুঃসাধ্য। কবি সম্প্রদায়ের মেজাজ আমার জানা উচিত ছিল, কিন্তু বোধ হচ্চে দেবা ন জানন্তি। যাই হোক এখন থেকে শত হস্তেন কবিনাম্। তোমার সাহস আছে— বয়সও অল্প, এই বিপদজনক অধ্যবসায় তোমাকেই সাজ্‌বে।

ফিরে আসি তার পরে মোকাবিলায় কাজের কথায় আলোচনা করব। ইতি ৭/১০/৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪
২১ অক্টোবর ১৯৩৮

[SANTINIKETAN, BENGAL]

কল্যাণীয়েষু,

মস্ত একটা ছিদ্র আছে আমার রচনার ঘটে। এক দিক থেকে যা ভর্তি হয় অন্য দিক থেকে তা নিষ্ক্রান্ত হতে বিলম্ব করে না। কিশোরকান্তর[১] অভিনন্দন পত্রখানা কবে পৌঁছেছে গিয়ে 'পাঠশালায়'[২] তা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। বোধ হচ্ছে যেন নাচনের[৩] নামে হেমন্তবালা[৪] আমাকে যে পত্রখানা লিখেছিলেন সেইটের সঙ্গে জড়িয়ে কবিতাটা তুমি ছাপতে ইচ্ছা করেছিলে— তা যদি হয় তাহলে সেই প্রসঙ্গে পূর্বপ্রকাশিত কবিতা আবার প্রকাশ করলে দোষ হবে না। আমি আজ নাচনের উদ্দেশে যে পত্রখানি লিখেছি সেটা ব্যবহার করলে চক্রটা সম্পূর্ণ হতে পারবে। যে পত্র বাহনরূপে তুমি এনেছিলে আমার কাছে সেই পত্রের উত্তরটিও তোমাকে পাঠাই, তুমি যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দিয়ো। কাগজে প্রকাশ করবার পক্ষে এটা যদি কটুস্বাদ হয়ে থাকে তবে চেপে যেয়ো।

বঙ্কিমের[৫] চিঠিখানি চমৎকার। কোনো এক অবকাশে কাজে লাগাতে পারব।

সাহিত্য পরিষদের জন্যে লেখা চেয়েছ।[৬] আমার পুরোনো লেখনীতে নতুন লেখা সরচে না। কী জীবনে কী রচনায় থামবার টর্মিনস লেখনী জোর করে পেরোতে গেলেই দুর্গতি ঘটায়।

'ভাষা পরিচয়ে'র[৭] ভূমিকাটা তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু ঐ বইটার' পরে অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের।[৮] শ্যামাপ্রসাদের কাছ থেকে যদি সম্মতি নিতে পারো তা হলে বাধা হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলে বোধ হয় আপত্তি হবে না।

কাব্যপরিচয় নিয়ে কবিদের মন সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। চেম্বারলেনি[৯] পদ্ধতিতে কাটা ছেঁড়া করে এই হিটলারি সম্প্রদায়ের উষ্মা নিবারণ করতে যদি পার তা হলে আমার পরিত্রাণের উপায় হবে।

মুক্তির উপায় যখন তোমাকে দিয়েছিলুম আমার মন ছিল নিষ্কাম। যদি দক্ষিণা দিতে চাও আমার নিজ ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দিলে পুণ্যলাভ করবে। ইতি ২১/১০/৩৮

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত ও সস্ত্রীক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৫ নভেম্বর ১৯৩৮, শান্তিনিকেতন।
শম্ভু সাহা গৃহীত আলোকচিত্র শ্রীমতী উমারানী দাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৫
২৭ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা[১] সম্বন্ধে কয়েক লাইন লিখে পাঠালুম।

পিওনের পদ পেয়ে পথের মধ্যে তুমি ডাক মেরেছ এ জন্যে হেমন্তবালার[২] কাছে তোমার জবাবদিহী, আমার কর্তব্য আমি করেছি।

সুনীতিকে[৩] সঙ্গে নিয়ে তুমি এখানে আসবার সংকল্প করেছ শুনে খুশি হলুম। ভাষা সম্বন্ধে আমার বইখানি তাঁর নামেই উৎসর্গ করচি। তাঁকে দেখিয়ে রাখব বলে অনেকদিন অপেক্ষা করেছিলুম। তিনি ছিলেন প্রবাসে। ছাপা আরম্ভ হয়ে গেছে, তবু এখনো সময় উত্তীর্ণ হয়নি। তিনি এলে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারবেন। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাবলীতে ভুক্ত হবে। আনাড়ি হাতের ভুলচুক না থাকাই উচিত। তোমাদের যখন অবকাশ এসো। বেশি সঙ্গী এনো না, বিদ্যালয় খোলবার মুখে অভিভাবকদের ভিড় হবে। ইতি ২৭/১০/৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা প্রকাশের আয়োজন যাঁরা করেছেন তাঁদের প্রতি সাধুবাদ সাহিত্যিক সৌজন্যের প্রচলিত অলস রীতিরূপে প্রয়োগ করলে উদ্যোগীদের বঞ্চনা করা হবে। কেন না এই সকল গ্রন্থের যথোচিত গ্রাহক ও পাঠক থাকলে তাঁরা সাধুবাদের চেয়ে উপযুক্ত পরিমাণে যথার্থ মূল্য পেতেন। শুনেছি তার কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যায় না। অথচ একথা মনে রাখতে হবে বাংলা সাহিত্যের পথরেখা অনেকখানি লুপ্ত হয়ে যেত যদি এই গ্রন্থগুলি উদ্ধারের চেষ্টা যথাকালে দেখা না দিত।

এই লেখাগুলিকে আমরা প্রাচীন ব'লেই গণ্য করি পঞ্জিকার তারিখ গণনা ক'রে নয়, এদের কালান্তরবর্তিতার সীমা-নির্ণয় ক'রে। বাংলা গদ্যসাহিত্যের আরম্ভ হয়েছে দূরকালে নয়, অন্যকালে। তখন বাংলা ভাষার ভূমিভাগে মাটি শক্ত হয়ে ওঠে নি, সাহিত্যের পথ হয় নি পাকা, তখন ভাবের ও চিন্তার চলাফিরা ছিল সংশয়িত গতিতে। ভাষা যে মনের ধাত্রী তখন সে মন আপন আশ্রয়ের শিথিলতাবশত সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে পারেনি। সেইজন্য সেই সকল গ্রন্থে প্রাচীনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। ইতিহাসে অনুরাগী যাঁদের মন তাঁরা এর রস পাবেন। আর যাঁদের ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠা নেই তাঁরা বর্তমানের সম্পূর্ণ পরিচয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই দূরব্যাপী মনোযোগে ঔদাসীন্য অগভীর শিক্ষার লক্ষণ।

এত আশ্চর্য দ্রুতবেগে বাংলা সাহিত্যের বৃদ্ধি হয়েছে যে এর সময়ের পথে মাইলের পরিমাপচিহ্ন সিকি মাইলের মাত্রাতেই দেওয়া সংগত। এ সাহিত্যে অল্পদূরে এগোলেই পিছনের দিকে দূরবীণ ধরার দরকার হয়ে পড়ে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের মতে যে সকল লেখক আধুনিক সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক তাঁদের রচনারও প্রথম অংশ বাংলাসাহিত্যের পূর্বাহ্নের [পূর্বাহ্ণের] পূর্বপ্রহরের অন্ধকারে অপরিস্ফুট।

সেই জন্যেই সময় থাকতে এই বেলা এই সাহিত্যের অগোচরপ্রায় প্রাগ্‌বিভাগকে গোচরে আনবার অধ্যবসায়কে উৎসাহ দেওয়া বাংলাদেশের পক্ষে নিতান্তই কর্তব্য।

ইতি ২৭/১০/৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন

১৬
৩১ অক্টোবর ১৯৩৮

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

সর্বত্রই লেখা দিয়ে থাকি নিস্পৃহ ভাবে। পরিবর্তে মূল্য যদি পাই সম্মানের কথা বিচার করি নে। কেন না সে কথা বিচার করতে গেলে অহংকারকে প্রশ্রয় দেবার আশঙ্কা থাকে। কাজ কী! অলকা[১] থেকে যে পরিমাণ দক্ষিণা পেয়েছি সেটা সেই পরিমাণে কাজে লাগবে, ধন্যবাদ দিতে রাজি আছি তার চেয়ে বেশি পরিমাণে। তোমরা[২] শনিবারে আসবে শুনে খুশি হলুম।

নাচনের[৩] চিঠিখানি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছ আশা করি। ইতি ৩১/১০/৩৮

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭
১১ নভেম্বর ১৯৩৮

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

রঙ্গমঞ্চে মুক্তির উপায়ের মুক্তি সাধন ঘটল না।[১] প্রয়োগকুশল নটের অভাব।

কাব্যপরিচয়ের আদ্য এবং মাধ্যদের শ্রাদ্ধ সমাধা হয়ে গেছে —সুতরাং তাঁরা অশান্তি ঘটাবেন না। অন্ত্যরা ভয়াবহ। আমি শান্তিপ্রয়াসী, খর রসনার আস্ফালনে ভীত। সাহিত্যে অত্যন্ত যাঁরা প্রত্যন্ত দেশীয় তাঁরাও আমাকে ভয় করেন না। সেই জন্যেই অন্ত বর্গের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভার তোমারই উপরে। তোমার চর্মে খর নখরের প্রখরতা প্রতিহত হবে জানি। কবির দল বরযাত্রদলের মতো, সংকলনকর্তা কন্যাকর্তার সমপর্যায়ের। মাথা-হেঁট করেও বোধ হয় তুষ্টিসাধন করতে হবে। তাই বলে মাথা ধূলোয় লুটিয়ো না। এই অনুষ্ঠানে হিটলার চেম্বারলনী পালার সাহিত্যিক রূপ দেখতে পাব আশা করচি। অর্থাৎ নিজের মানহানি করেও যতটা পারো সব দাবীই মেনে চলতে হবে না। কিন্তু তাঁরা যাঁদের চার্চহিল কুপার[২] বলে ত্যাজ্য করতে চান তর্জনের ভয়ে তাঁদের বর্জন করাটা অবৈধ হবে। এ গ্রন্থে রবাহূত অনাহূতদেরও যথাসম্ভব পাতপেড়ে দেবার আমি পক্ষপাতী। যাই হোক্ এবার যে লড়াই হবে আমি দূর থেকে তাই দেখব— তাতে কৌতুক আছে। ইতি ১১/১১/৩৮

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮
[২৯ নভেম্বর ১৯৩৮]

'Silvroaks', Luker Road, Allahabad — এই ঠিকানা থেকে জনৈক মহিলার লেখা একখানি চিঠির উপরে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখে, সজনীকান্ত দাসকে মন্তব্য সহ চিঠিটি পাঠিয়ে দেন।

[শান্তিনিকেতন]

সজনীকান্ত,

কাব্য পরিচয়ের দ্বিতীয় দেহান্তর কাল কত দূরে। পত্রখানি তোমার দৃষ্টি[র] জন্য পাঠাই। তোমাদের কাজ শেষ হবে কিন্তু পত্রের পথ বন্ধ হবে না।

সুফিয়া হোসেনের[১] কবিতার বই সম্প্রতি হাতে পড়ল। বিশেষ সমাদরের যোগ্য সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ

১৯
[৩০ নভেম্বর ১৯৩৮]

ওঁ

[শান্তিনিকেতন]

আগামী সংস্করণ কাব্যপরিচয়ের জন্যে হেমলতা বৌমার[১] রচিত একটি কবিতার কপি পাঠালুম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রেম

যেখানে ফুটিলে প্রেম, রহি সেইখানে
সুগন্ধে ভরিলে প্রাণ, আনন্দে আকুল
করিলে সবার চিত্ত, তব সমতুল
নাহি এ ধরায়। মৃত্যু হরি লয়ে যায়
লক্ষ লক্ষ প্রাণ, লুপ্ত করে তমসায়।
যেখানে ফুটিলে তুমি, রহি সেইখানে
মৃত্যুরে করিলে কোলে, আনন্দের দোলে
দিলে যে তাহারে দোলা; গুপ্তদ্বার খোল
অমৃতের, দীনমর্ত্য পায় তার স্বাদ।
প্রেম তব স্বর্ণকান্তি নিত্য শোভা পায়
আপন আসনে বসি শুভ্র সুষমায়।
মৃত্যু ও অমৃতমাঝে যা আছে বিচ্ছেদ
পূর্ণতার মাঝে তার ঘুচায়েছ ভেদ॥

২০
১১ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

[মংপু]

কল্যাণীয়েষু

পূজোর ছুটি এখানে কাটিয়ে তবে স্বস্থানে ফিরব। আমার রচনাপঞ্জী[১] সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাও কোরো কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য উত্তর পাবার আশা রেখো না। আমার পঞ্জিকার তারিখ আন্দাজের

দ্বারা চালিত। তার কারণ আমার মনে ঘটনার পূর্বাপরতা বোধ তথ্যমূলক নয়, অনুভূতির স্পষ্টতা অনুসারে তারা আপনার পংক্তিগ্রহণ করে।

আমার শরীর সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা বোধ হয় তোমাদের ইচ্ছানুবর্তী। এ ঘর থেকে ও ঘর আমার পক্ষে বিদেশ— একে চলতে হয় সাবধানে, অভ্যস্ত নিয়ম আঁকড়ে ধরে— নতুন জায়গায় সেটা সহজসাধ্য হয় না, কষ্টকর হয়। মেদিনীপুর[১] যেতে হলে আমার পক্ষে একটা দৈহিক বিপ্লব হবে।

কলিকাতায় তোমার সঙ্গে দেখা হলে এ সম্বন্ধে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব। বস্তুত যথার্থ হিসাব মতে আমি অতীতের পর্যায়ভুক্ত, কোনোমতে বর্ত্তমানে আমার টিঁকে থাকা যাকে বলে এনাক্রনিজ্‌ম্‌ অর্থাৎ সময়লঙ্ঘন দোষ। ইতি ১১/১০/৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১

১৫ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

[মংপু, দার্জিলিং]

কল্যাণীয়েষু

তুমি আমাকে মুস্কিলে ফেললে। তোমার পত্রীতে যে লেখাগুলি উদ্ধৃত করেছ তার অধিকাংশ মনে আনতে পারচি নে অর্থাৎ এদের পক্ষে বা বিপক্ষে হলফ পড়ে সাক্ষ্য দেবার মত স্পষ্ট ধারণা আমার

নেই। অতএব তোমাদের তরফ থেকে আমার পঞ্জীতে এদের যদি স্থান দেও [য] উচ্ছেদ করবার মতো জোর আমার নেই। বাল্যলীলায় এরকম প্রলাপোক্তিকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিতে হবে। অতএব তোমাদের প্রমাণগুলিকে অঙ্গীকার করে নেওয়া গেল। প্রথম লর্ড লিটনের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে যে কবিতা লিখেছিলুম হিতৈষীদের সতর্কতা মান্য করে সেটা লোপ করে দেওয়া হয়েছিল। মনে আছে, কেউ কেউ সেটা হাতে লিখে প্রচার করে বেড়াতেন।

পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের সে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম সেটা যে তখনকার কালের তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ পর্যন্ত আমার মনে ছিল। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক এই যে, সম্পাদক বেদান্তবাগীশ[১] মহাশয় ছাপানো হবে বলে বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন বালক শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে নি। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্য কোন যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্য রূপে পূরণ করে দিয়েছিলেন। শেষোক্ত কারণটিই সঙ্গত বলে মনে হয়। এই উপায়ে আমার মন তৃপ্ত হয়েছিল এবং কোনো লেখকেরই নাম না থাকাতে এতে কোনো অন্যায় করা হয়নি। এ না হলে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার আমার মনে থাকতে পারত না। ঝান্সীর রাণী[২] ও সান্ত্বনা[৩] প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছুই মনে নেই। ইতি ১৫/১০/৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২
১৯ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

[মংপু, দার্জিলিং]

কল্যাণীয়েষু

এখান থেকে ৫ই নবেম্বর নাগাদ কলকাতায় ফেরবার সংকল্প করেছি। তখন তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় আলোচনা হবে।

হেমন্তকুমারীর লেখাটি[১] খুব ভাল লাগ্‌ল, রচনাটি সুনিপুণ এবং আধুনিক জবানীতে যাকে বলে "সাবলীল।" ইতি। ১৯/১০/৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩
২৬ অক্টোবর ১৯৩৯

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়েষু

৫ই নবেম্বর[১] এখান থেকে আমার যাত্রা সুনিশ্চিত। অদৃষ্ট অনিশ্চয়তার জাল ফেলে সে ধীবরবৃত্তি করেন সে সম্বন্ধে কোন কথা বলতে সাহস করিনে। ইতি ২৬/১০/৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের রচনার তালিকা-সহ শংসা পত্র

২৪
২১ নভেম্বর ১৯৩৯

শ্রীমান সজনীকান্ত দাস আমার বাল্য ও কৈশোরের বেনামী রচনাগুলি আবিষ্কার করে আমাকে বিস্মিত করেছেন। পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমার সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা "অভিলাষ" তাঁহার অভিনব আবিষ্কার। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটেছিল। জ্যোতিদাদার প্রথম চারটি নাটকের অধিকাংশ কবিতা এবং গান যে আমারি রচনা তা সজনীকান্তের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়ায়নি। হিন্দুমেলায় দিল্লি দরবার সম্বন্ধে আমার পঠিত কবিতাটি 'স্বপ্নময়ী'তে আত্মগোপন করেছিল সেটাও সজনীকান্তের ইঙ্গিতে ধরা পড়েছে। সজনীকান্ত প্রদত্ত নিম্নলিখিত তালিকাকৃত রচনাগুলি নিঃসংশয়রূপে আমার। কিন্তু পরবর্তী তালিকার রচনাগুলি সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারিনি। আমি সে দিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য[১] ও অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর[২] ইত্যাদি ছদ্মনামে এককালে অনেক লেখাই লিখেছি তা জেনেও বেশ কৌতুক বোধ করচি। এখানে বলা আবশ্যক শেষোক্ত নামটি কোনো লেখক অন্য কোনো কোনো রচনায় আত্মসাৎ করেচেন বলে আমার সন্দেহ হচ্চে।

শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

VISVA-BHARATI

Founder-President
Rabindranath Tagore

Santiniketan
Bengal
India

প্রথম তালিকা

১। "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র" বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রথমাংশ, বেদান্তবাগীশ মহাশয় কর্তৃক সংশোধিত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৮ম কল্প, ৩য় ভাগ, ১৭৯৫ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ হইতে কয়েক সংখ্যায়।

২। "অভিলাষ" কবিতা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৮ম কল্প, ৪র্থ ভাগ, অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬ শকাব্দ।

৩। "প্রকৃতির খেদ" কবিতা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৯ম কল্প, ১ম ভাগ, আষাঢ়, ১৭৯৭ শকাব্দ।

৪। "ভারত" কবিতা, ভারতী, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ।

৫। "হিমালয়" কবিতা, ভারতী, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র।

৬। "আগমনী" কবিতা, ভারতী, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন।

৭। 'শারদজ্যোৎস্নায়" কবিতা, ভারতী, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, কার্তিক।

৮। "ঝান্‌সীর রাণী" প্রবন্ধ ভারতী ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ।

৯। "সম্পাদকের বৈঠকে" অনুবাদ কবিতাগুলি, ভারতী ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, মাঘ ও ১২৮৫ আষাঢ়, ১২৮৬ কার্তিক, ১২৮৭ আশ্বিন।

১০। "সান্ত্বনা" প্রবন্ধ, ভারতী ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, চৈত্র।

১১। "সামুদ্রিক জীব" বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ভারতী ১২৮৫ বঙ্গাব্দ বৈশাখ

১২। "ইংরেজদিগের আদবকায়দা" প্রবন্ধ, ভারতী ১২৮৫ বঙ্গাব্দ, জ্যৈষ্ঠ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

VISVA-BHARATI

Founder-President
Rabindranath Tagore

Santiniketan
Bengal
India

১৩। "স্যাকসন জাতি ও অ্যাঙ্গলোস্যাকসন সাহিত্য" প্রবন্ধ, ভারতী, ১২৮৫ শ্রাবণ।

১৪। "বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য" প্রবন্ধ, ভারতী ১২৮৫ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র।

১৫। "কবিতাপুস্তক" সমালোচনা, ভারতী ১২৮৫ বঙ্গাব্দ ভাদ্র।

১৬। "পিত্রার্কা ও লরা" প্রবন্ধ ভারতী ১২৮৫ বঙ্গাব্দ ভাদ্র

১৭। "গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ" প্রবন্ধ ভারতী ১২৮৫ বঙ্গাব্দ কার্ত্তিক।

১৮। "নর্ম্যান জাতি ও অ্যাঙ্গলোনর্ম্যান সাহিত্য" প্রবন্ধ, ভারতী ১২৮৫ বঙ্গাব্দ ফাল্গুন ও ১২৮৬ জ্যৈষ্ঠ।

১৯। "চ্যাটার্টন— বালক কবি" প্রবন্ধ, ভারতী ১২৮৬ বঙ্গাব্দ আষাঢ়।

২০। "ভাসিয়ে দে তরী"— গান, ভারতী ১২৮৬ বঙ্গাব্দ ভাদ্র।

২১। "বাঙ্গালী কবি নয়"— প্রবন্ধ, ভারতী ১২৮৭, ভাদ্র।

২২। "বাঙ্গালী কবি নয় কেন" প্রবন্ধ, ভারতী ১২৮৭ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন।

২৩। "নিন্দাতত্ত্ব"— প্রবন্ধ, ভারতী, ১২৮৬ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

VISVA-BHARATI

Founder-President
Rabindranath Tagore

Santiniketan
Bengal
India

দ্বিতীয় তালিকা

১। “বঙ্গে সমাজ বিপ্লব” প্রবন্ধ, ভারতী, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, মাঘ।

২। “বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য” প্রবন্ধ, ভারতী, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, মাঘ

৩। ~~“ফেডিনাঁ তে লেসেভা এবং সুয়েজের খাল” প্রবন্ধ, ভারতী ১২৮৫ বঙ্গাব্দ, আষাঢ়~~

৪। ~~“নিন্দাতত্ত্ব” প্রবন্ধ, ভারতী, ১২৮৬ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন~~

৫। “সারদা-মঙ্গল” সমালোচনা, ভারতী ১২৮৬ বঙ্গাব্দ, মাঘ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
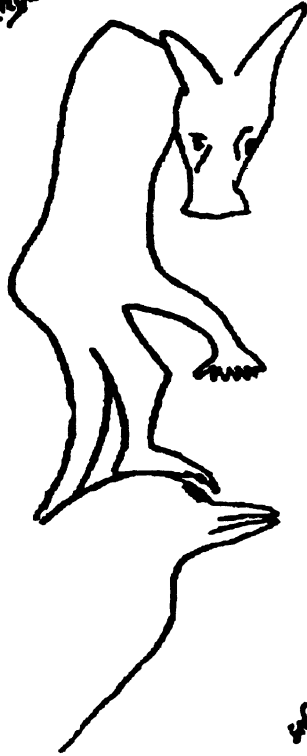
"সাহিত্য অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি"
রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত কৌতুক চিত্র

২৫

অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম। তারি এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা হ'লেই আশাজনক হবে।

[অবচেতনার অবদান]

গল্‌দা চিংড়ি, তিংড়ি মিংড়ি,
লম্বা দাঁড়ার করতাল।
পাকড়াশিদের কাঁকড়া ডোবায়
মাকড়শাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাঁদর
ল্যাজখানা যায় ছিঁড়ে,
পালতে মাদার, সেরেস্তাদার
কুটছে নতুন চিঁড়ে।
কলেজ পাড়ায় শেয়াল তাড়ায়
অন্ধ কলুর গিন্নি।
ফটকে ছোঁড়া চটকিয়ে খায়
সত্যিপিরের সিন্নি।
মুল্লুক জুড়ে উল্লুক ডাকে,
ঢোলে কুল্লুক ভট্ট।
ইলিশের ডিম ভাজে বঙ্কিম
কাঁদে তিনকড়ি চট্ট।

গরাণহাটায় সজনেডাঁটা
কিনছে পুলিশ সার্জন।
চিৎপুরে ঐ নাগা সন্ন্যাসী
কাৎ হয়ে মরে চারজন।
পঞ্চায়েতের চুপড়ি বেতের,
শর্ষে ক্ষেতের চাষী।
কাঁচা লঙ্কার ফোড়ন লাগায়
কুড়োন চাঁদের মাসি।
পটোলডাঙায় চক্ষু রাঙায়
মুর্গিহাটার মিঞা।
শম্ভু বাজায় তম্বুরাটায়
কেঁয়াও কেঁয়াও কিঞা।
ঠনঠনে আজ বেচে লণ্ঠন
চার পয়সায় আটটা।
মুখ ভেংচিয়ে হেডমাস্টার
মন্তুরে করে ঠাট্টা।
চিন্তামণির কয়লাখনির
কুলির ইনফ্লুয়েঞ্জা।
বিরিঞ্চিদের খাতাঞ্চি [১] ঐ
চণ্ডীচরণ সেনজা।
শিলচরে হায় কিল চড় খায়
হস্টেলে যত ছাত্র।
হাজি মোল্লার দাঁড়ি মাল্লার
বাকি একজন মাত্র।

দাওয়াইখানায় সিঙারা বানায়,
উচ্চিংড়েটা লাফ দেয়।
কনেস্টেব্‌ল পেতেছে টেব্‌ল
ক্ষুদিরে চায়ের কাপ দেয়।
গুবরে পোকার লেগেছে মড়ক,
তুবড়ি ছোটায় পঞ্চু।
ন্যায়রত্নের ঘাড়ের উপর
কাকাতুয়া হানে চঞ্চু।
সিরাজগঞ্জে বিরাট মীটিং,
তুলো বের করা বালিশ।
বংশু ফকির ভাঙা চৌকির
পায়াতে লাগায় পালিশ।
রাবণের দশ মুণ্ডে নেমেছে,
বকুনি ছাড়ায়ে মাত্রা।
ন্যাড়ানেড়ি দলে হরি হরি বলে,
শেষ হ'ল রামযাত্রা॥

"পুনশ্চ" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯/১১/৩৯

১. 'ছড়া' গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ 'খাজাঞ্চি'
দ্র র-র ১৩ সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৯৮, পৃ. ১০৩-০৪।

২৬

নিজের রচনার আবর্জিত রচনা সম্পর্কে অভিমত

গাছতলায় শুক্‌নো পাতার নীচে ঝড়ে-পড়া কাঁচা পাকা ফল কিছু ন
কিছু পাওয়া যায়। আমার আবর্জ্জিত ছিন্ন পাতার মধ্য থেকে সে লেখার
টুক্‌রোগুলি আমার তরুণ বন্ধু[১] কুড়িয়ে পেয়েচেন মনে হচ্চে সেগুলি
সাহিত্যের ভোজে ব্যবহার করার বাধা নেই। তাই তিনি যখন ভাণ্ডারে
তোলবার প্রস্তাব করলেন আমি সম্মতি দিলাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭
৩০ নভেম্বর ১৯৩৯

ওঁ

'UTTARAYAN
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

তোমার কাছ থেকে তাড়া পাবার বহুপূর্ব্বেই অভিভাষণ[১] শে
করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি।

রচনাবলী সম্বন্ধে সমস্যা তোমার দফতরে জমে উঠচে। তা
নিয়ে পত্রযোগে কথা চালাচালি আমার পক্ষে বড়ো দুঃসাধ্য। সে
কারণে একটা প্রস্তাব আমার মাথায় এসেছে। তোমরা ঠি
করেছিলে সময় বাঁচাবার জন্য হাওড়ায় যান পরিবর্তন করা যাবে

আমি মনে করি তা না করে রচনাবলী প্রভৃতি নানা পরামর্শ মোকাবিলায় ঐ সময়ে চুকিয়ে নেওয়া যেতে পারে। দেহটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার চেয়ে কিছুক্ষণ স্থির থাকা আমার পক্ষে হয়ত শ্রেয় হতে পারে।

গানগুলো কালানুক্রম অনুসরণ করে মাঝে মাঝে দিলেই তো ভালো হয়। সেটাই বেশি উপভোগ্য হবে। পাঠান্তর গুলো তৃতীয় খণ্ড থেকে মূল গ্রন্থের সঙ্গে রেখে ছাপানোই সঙ্গত হবে। এমন কি আমার মতে রাজা ও রাণী ও বিসর্জনের বর্জিত অংশ তৃতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে দেওয়াই উচিত।[৩] তাদের দর্শনপ্রাপ্তির জন্যে পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করা বিড়ম্বনা। ছোটোখাটো পাঠান্তর পাদটীকায় দিলে কি দোষ আছে? এই প্রণালীতেই পাঠকেরা যথার্থ উপকৃত হবে।

মানসীর 'শেষ উপহার' কবিতা যে ইংরেজি কবিতার ইঙ্গিত নিয়ে রচিত সেটা লোকেন পালিতের রচনা।[৪]

কোনো প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে যদি এখানে আসতে চাও যেদিন তোমার অবকাশ আসতে পারো।—আমার পক্ষে আজও যেমন কালও তেমন— সঙ্গে পাণ্ডা সুধাকান্তকে সংগ্রহ করে আনলে তোমার সুবিধা হবে। ইতি ৩০/১১/৩৯

রবীন্দ্রনাথ

২৮
১ ডিসেম্বর ১৯৩৯

'বঙ্কিম রচনাবলী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত

[বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ)
সম্পাদক
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - শ্রীসজনীকান্ত দাস]

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীর[১] যে শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তাকে বঙ্কিমের সাহিত্য কীর্তির বাণী-সৌধ বলা যেতে পারে। কী মুদ্রণ নৈপুণ্যে, কী ঐতিহাসিক বিচারে, কী তৎকালীন লোকমতের বিবৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি গৌরব রক্ষার এই সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সমুজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছে। এজন্য এই ব্যাপারের কর্তৃপক্ষ ও সহায়কগণকে বাংলাদেশের হয়ে সাধুবাদ নিবেদন করি। ইতি ১/১২/৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯
[৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯]

[শান্তিনিকেতন]

কল্যাণীয়েষু

সুধাকান্তকে বাহন করে তুমি এখানে উপস্থিত হয়ে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করবে কথা ছিল। সে সম্বন্ধে তোমাদের উভয় পক্ষের কাছ থেকেই কোনো কথা পাওয়া গেল না। এদিকে কর্পোরেশন পথের মধ্যে থেকে আমাকে হরণ করে নেবেন[১] রব উঠেছে, প্রস্তাবটার নিষ্পত্তি করবেন সুধাকান্ত তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে এই ছিল কথা, মন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো খবর পাই নি। এটা বিজনেসলাইক নয়। ইতিমধ্যে তিনি আমাদের দর্শন দেবেন কি না তারও কোনো আভাস পাইনি। চির[২] তাঁর বাড়িতে আমাকে অতিথি রূপে পেতে চান, আমি একটি সম্পূর্ণ নিরালা বাড়ির দাবি জানিয়েছি। তুমি তো সেই রকম আশ্বাস দিয়েছিলে। এখন কি ব্যবস্থা পরিবর্তনের আশঙ্কা আছে না কি। তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় সব কথা পরিষ্কার হলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

তুমি যে সংস্কৃত শ্লোকের তর্জমা পাঠিয়েছ[৩] তার ভাষাটা আমার সেকালে ভাষারই মতো কিন্তু স্মৃতির নিশ্চিত সাক্ষ্য পাচ্চি নে। সেকালে তত্ত্ববোধিনীতে এ রকম কবিতা লিখিয়ে আর কেউ ছিল বলে মনে তো পড়ে না। ইতি

রবীন্দ্রনাথ

৩০
৪ জানুয়ারি ১৯৪০

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

নাৎনির অতলস্পর্শ শুভোদ্বাহকর্ম্মনি কয়দিন হাবুডুবু খেয়েছি।[১] স্থির করেছিলুম এবার নৈষ্কর্ম্য সাধন করব— কিন্তু শনৈশ্চরের দয়ামায়া নেই, নানারকম দাবীর উল্কাবর্ষণ চলচে।

আজকাল আমার স্প্রিংভাঙা কলম নিয়ে ঠেলাঠেলি করতে শিরদাঁড়া বেঁকে যায়, তবু কি এই পথেই অন্তিমকৃত্যের হলকর্ষণ চলবে, উত্তর গোষ্ঠের কোনো সন্ধান পাওয়া যাবে না?

তোমার সময়মতো একবার এসো, বানানের মন্ত্রণাসভা বসানো যাবে।[২] রচনাবলী সম্বন্ধেও হয় তো পরামর্শের প্রয়োজন থাকতে পারে। সুধাকান্ত জ্বরে শয্যাগত।

চারুবাবুকে[৩] একবার জিজ্ঞাসা কোরো আমার যে সব ইংরেজি রচনা ম্যাকমিলানের স্বত্ববহির্ভূত সেগুলোকে তোমাদের প্রকাশ যজ্ঞে আহুতি দেওয়া চলবে কি না। বাঙালির রচনা বলেই সেগুলি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয় এমনতরো জনশ্রুতি আছে।

মনোরমা সম্বন্ধে কয়েক লাইন সদ্য লিখে দিলুম[৪] ক্লান্ত অবকাশের "সাবলীল" আলস্যভরে। ইতি ৪/১/৪০

রবীন্দ্রনাথ

৩১
৫ জানুয়ারি ১৯৪০

[শান্তিনিকেতন]

[কল্যাণীয়েষু]

যখন মন্ত্রী অভিষেক[১] প্রবন্ধটি লিখেছিলুম তার পরে এখন কালের প্রকৃতি বদলে গেছে, তাই এ লেখাটি এখনকার মনের মাপে মিলবে না। দুই কালের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে তখন রাজদ্বারে আমাদের ভিক্ষার দাবি ছিল অত্যন্ত সংকুচিত। আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুয়া, পাখা ঝাপটিয়ে চেঁচাতুম পায়ের শিকল আরো ইঞ্চিকয়েক লম্বা করে দেবার জন্যে। আজ বলছি দাঁড়ও নয় শিকলও নয় পাখা মেলব অবাধ স্বরাজ্যে। তখন সেই ইঞ্চি দুয়েকের মাপের দাবি নিয়েও রাজপুরুষের মাথা গরম হয়ে উঠত। আমি সেই চোখরাঙানীর জবাব দিয়েছিলুম গরম ভাষায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ-ছিল আমার ওকালতি সেকালের পরিমিত ভিক্ষার প্রার্থীদের হয়ে। "আবেদন আর নিবেদনের থালাকে" তখনো আমি অশুচি ব'লে মেনেছি, এবং তৎকালীন কংগ্রেসের বিনম্র দীনতা আমার হাতে ভর্ৎসনা পেয়েচে। এই কথা প্রমাণের জন্য তখনকার সাংবাদিক দলিল থেকে দিনক্ষণ তারিখের উদ্ধারের ভার রইল তাঁদের পরে যাঁরা কাটা ফসলের পুরোনো ক্ষেতে উদ্বৃত্ত সংগ্রহে সুদক্ষ।

৫/১/৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২
২০ জানুয়ারি ১৯৪০

ওঁ

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

অবচেতনার অবদান সম্বন্ধে তোমাকে মুখে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম তার কোনো আইনসঙ্গত দাম নেই। লেখনযোগে পাকা দলিলে দিতে পারি যদি এখানে ঝাড়গাঁর[১] সংস্রব লাভ করি। অতএব সে জন্যে সবুর করতে হবে। যদি ফস্‌কে যায় তাহলে মন অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠবে, অবচেতনা যাবে অচেতনে তলিয়ে।

অমিয়[২] ভাগলপুরে। আজ তাকে টেলিগ্রাফ করেছি আসতে। যথাসময়ের পূর্বেই যাতে যথোচিত উপায় করা হয় তার ব্যবস্থা করা যাবে কিন্তু "বিজয়ায় সঞ্জয়" আশা করচি নে।[৩] আমাদের বোধ হচ্চে নৌকোডুবি হোলো, যদি হয় তাহলে সেটা ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ক্ষতিপূরণের ভার তোমাদেরই নিতে হবে— এটা যে ঠিক দুঃশাসনের বস্ত্রহরণ, লজ্জা নিবারণ কে করবে? ইতি ২০/১/৪০

রবীন্দ্রনাথ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

পত্র ৩২। পাণ্ডুলিপিচিত্র

৩৩

[১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

ওঁ

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

আগামী রবিবারে পুলিন[১] আসচেন রচনাবলী উপলক্ষ্যে। ঐ আলোচনা ক্ষেত্রে তোমার উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক। আমি একাকী অসহায়— আমাকে যদি সাহায্য না কর আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হবে। ইতি বৃহস্পতিবার

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৪

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

VISVA-BHARATI

Founder-President
Rabindranath Tagore

Santiniketan,
Bengal
India

Ref. No. ....   *Date :* ......২৮/২/৪০..,... *193*

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ন খলু ন খলু বাণঃ
সন্নিপাত্যোয়মস্মিন্
মৃদুনি কবি শরীরে—

তোমরা জানো কোনো রকম পতিত্ব করবারই বয়স আমার নয়[১] —দোহাই তোমাদের, এই ধুলো-ওড়ানো ঝোড়ো দেশে কোনো উচ্চ চূড়ায় আমাকে চড়িয়ে দিয়ে মজা দেখো না। সভাপতিত্ব গ্রহণ করবার উপযুক্ত কুলীন সাহিত্যিক বাংলাদেশে অনেক আছে— সম্মার্জনী থেকে আরম্ভ করে বরমাল্য পর্যন্ত সব তাঁদের সহ্য করবার অভ্যাস আছে, আমি ভীরু, দেহে মনে আমি দুর্বল— যে কটা দিন বেঁচে আছি আমি শান্তি চাই।

আপাতত চললুম বাঁকুড়ায়— চাণ্ডীদাসিক চক্রবাত্যার কেন্দ্রস্থল[২] থেকে দূরে থাকব। ফিরে আসব চৌঠো[৩] নাগাদ— তারপরে সাক্ষাতের প্রত্যাশা রইল

রবীন্দ্রনাথ

৩৫
৮ মার্চ ১৯৪০

ওঁ

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

বাঁকুড়ায় যে রকম খাটতে হয়েছিল এমন কোথাও হয় নি। মাঝে মাঝে আমার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে ভয়ের কারণ ঘটেছিল কাউকে বলি নি, কর্তব্য করে গিয়েছি। আরম্ভে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলুম, অন্তে পারিশ্রমিক পাইনি বললেই হয়— আমাদের সঙ্গীত ভবনের নিরসন দশায় উদ্বিগ্ন হয়েছি।[১] এমন অবস্থায় ঝাড়গ্রামকে[২] ভুলতে পারছি নে। বলেছিলে দেখা করতে আসবে আলাপ আলোচনা করবে— আশু তার কোনো আশা আছে কিনা জানতে চাই। তোমার প্রাপ্য সম্বন্ধে বঞ্চিত করব না আমার প্রাপ্য যদি সুনিশ্চিত থাকে অবচেতন চিত্ত[৩] শব্দার্ঘ সম্বন্ধে হতবুদ্ধি থাকতে পারে কিন্তু পণ্য অর্ঘ সম্বন্ধে সজাগ।

ইতি ৮/৩/৪০

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬
১৮ মে ১৯৪০

ওঁ

গৌরীপুর ভবন
কালিম্পঙ

কল্যাণীয়েষু

সজনী, প্রতিশ্রুত ছিলুম তোমাকে একটি ছড়া দেব, সেটা রক্ষে করলুম।[১] সর্ত ছিল তুমি ঝাড়গ্রাম ঝাড়া দিয়ে বিশ্বভারতীর হাতে কিছু দক্ষিণা এনে দেবে। প্রত্যক্ষভাবে সে শর্ত পূরণ হয়নি আশ্বাসের আকারে মনের সামনে রয়ে গেছে। প্রয়োজনের প্রখরতা বেড়ে যাচ্ছে— কিস্তিতে কিস্তিতে কিছু পাওয়া যায় কি? ভেবে দেখো সেটা সুবুদ্ধির কাজ হবে কিনা। শুনচি সুধাকান্ত ধূর্জটিল মুখরতার[২] বিরুদ্ধে তোমাকে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়েছে। এ নিয়ে আমার মনে দ্বিধা আছে। যদিও তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছি তবু লোকে বলবে আমি এই রচনার "পৃষ্ঠপোষক" এবং এই সূত্রে শনিগ্রহের সঙ্গে রবিগ্রহের দেনাপাওনা চলছে। তোমাদের সকলের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ নিষ্কাম হয় এই আমার কামনা। তুমি ভেবে দেখো, এবং যেখানে আমার কোনো সমর্থন আছে সেটা বর্জন কোরো। ধূর্জটির লেখায় আমার একমাত্র বিরক্তির কারণ অমিয়র প্রতি তার ইস্কুলমাষ্টারির মুরুব্বিয়ানা। অভ্রভেদী অহমিকায় ধূর্জটি ভুলে গিয়েছে সাহিত্যে অমিয়[র] বৈদগ্ধ্য তার চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু রুচির ক্ষেত্রে ধৃষ্টতা সহ্য করতেই হয়। যাই হোক আমাকে শান্তিতে থাকতে সাহায্য কোরো— বয়েস হয়ে গেছে। ইতি ১৮/৫/৪০

রবীন্দ্রনাথ

ছড়া

সুবলদাদা আনল টেনে আদম দিঘির পাড়ে,
লাল বাঁদরের নাচন সেথায় রামছাগলের ঘাড়ে।
মনিব মিঞা, বাঁদরটাকে খাওয়ায় শালিধান্য,
রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্য।
দাড়িটা তার নড়ে কেবল, বাজেরে ডুগ্‌ডুগি,
কাৎলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগ্‌বুগি।

রামছাগলের মোটা গলার ভ্যাভ্যা রবের ডাকে,
সুড়সুড়ি দেয় থেকে থেকে চৌকিদারের নাকে।
হাঁচির পরে বারে বারে যতই হাঁচি ছাড়ে,
বাতাস জুড়ে ঘনঘন কোদাল যেন পাড়ে।
দত্ত বাড়ির ঘাটের কাছে যেমনি হাঁচি পড়া
আঁৎকে উঠে কাঁখের থেকে বৌ ফেলে দেয় ঘড়া।
কাকেরা হয় হতবুদ্ধি, বকের ভাঙে ধ্যান।
এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন।
হাঁচির ধাক্কা এতখানি এটা গুজব মিথ্যে
এই নিয়ে সব কলেজ পড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে
অল্প কিছু লাগ্‌ল ধাঁধা, রাগ্‌ল অপর পক্ষে,
বল্‌লে, "ফিজিক্স পড়ে কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে।
অন্য দেশে অসম্ভব যা, পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস্‌ যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ সে।"
এই নিয়ে দুই দলে মিলে ইঁটপাটকেল ছোড়া,
হায়রে কারো ভাঙলো কপাল, কেউ বা হোলো খোঁড়া।

গোল দিঘি লাল দিঘি জুড়ে বীর পুরুষের বড়াই,
সমুদ্দুরের এ পারেতে এরেই বলে লড়াই।
সিন্ধুপারে মৃত্যুদূতের চলছে নাচানাচি,
বাংলাদেশের তেঁতুল বনে চৌকিদারের হাঁচি।
সত্য হোক বা আজগুবি হোক,— আদমদিঘির পাড়ে
বাঁদর চড়ে বসে আছে রাম ছাগলের ঘাড়ে।
ছেলেরা সব হাততালি দেয়, বাজেরে ডুগ্‌ডুগি,
গভীর জলে কাৎলা খেলায়, জল ওঠে বুগ্‌বুগি॥

রবীন্দ্রনাথ্

৩৭
৩ জুন ১৯৪০

ওঁ

[কালিম্পঙ]

কল্যাণীয়েষু

দীর্ঘকাল তোমার কাছ থেকে চিঠির উত্তর না পেয়ে উদ্বিগ্ন ছিলুম। উত্তর পেয়ে যে উদ্বেগ কমল তা বলতে পারিনে। মারাত্মক ব্যাধি নিয়ে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় তুমি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলে। নিজের প্রতি এই অত্যাচার কী করে তোমার দ্বারা সম্ভব হোলো ভেবে পাইনে। চুপ করে থাক এখন কিছুদিন, এডিটরি রাজদণ্ড দাও আর কারও হাতে। আমার চিঠির উত্তর দিতে হয় দিয়ো মনে মনে। সাব-এডিটরকে বলে দিয়ো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুহৃজ্জনের কোনো লেখা ছাপিয়ে বঙ্গ-সাহিত্য-সরোবরের

তলার পাঁক ঘুলিয়ে দিয়ে ভারতীর পদ্মাসন যেন দুলিয়ে না দেয়। শীঘ্র আরোগ্য লাভ কর এই কামনা করি। ইতি ৩/৬/৪০

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ

৩৮
[৬ জুন ১৯৪০]

ওঁ

[কালিম্পঙ]

কল্যাণীয়েষু

সকল বিষয়েই আমি আনাড়ি, অশিক্ষার উপরে কাজ চালিয়ে দিই, সব সময়ে ধরা পড়িনে। আমার ডাক্তারির পক্ষে বলবার কথা এই যে, সাংঘাতিকতায় আমার ওষুধ ব্যামোকে ছাড়িয়ে যায় না। বায়োকেমিক বইটা ঘেঁটে দেখছিলুম। যে ঐ চিকিৎসার মতে নেট্রাম সালফ ডায়াবিটিসের প্রধান ওষুধ। তুমি এক কাজ কোরো। বোরিক অ্যাণ্ড ডিউয়ির 'টুয়েল্‌ভ টিসু রেমেডিজ'[১] আনিয়ে নিয়ো, বলাইয়ের[২] সাহায্যে সেটা ঘাঁটিয়ে নিয়ো। বায়কেমিক ওষুধের গুণ এই যে হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধের মতো এ শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। অন্য ওষুধের সঙ্গে এর ব্যবহার চলে, অন্তত আমি তো ব্যবহার করেছি। দিনে তিনবার খেলে আপত্তি করে না, অ্যাকিউট ব্যাধিতে সেইটেই ব্যবস্থা।

আমার মনের অবস্থা কর্মবিমুখ, আমার গ্রহ আমাকে খাটিয়ে নেয়, বাজে খাটুনিই বেশি। ইতি তারিখ পাঁজি দেখে ঠিক করে নিয়ো।

রবীন্দ্রনাথ

৩৯

[২৯ জুন ১৯৪০] [১]

ওঁ

[কালিম্পঙ]

কল্যাণীয়েষু

আমার ওষুধে ফল পেয়েছ। বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন। যে বয়সে স্বভাবতই অন্য খ্যাতির পথে বালি চাপা পড়ে, সেই বয়সে তিনি একটা নতুন পথ খুলে দিলেন। আমার জীবনচরিতের শেষ অধ্যায়ে এই খবরটা দিয়ে যেতে পারবে। এ বিদ্যেটা সরস্বতীর এলেকায় নয়, এটা ধন্বন্তরীর মহলে,— যেখানে রস নেই রসায়ন আছে— সাইকোলজির নাড়ি যাঁরা টেপেন এখানকার নাড়ির খবর তাঁদের হাতে নেই। (বলাইয়ের প্রতি কটাক্ষ করচিনে— পদ্মগন্ধে আয়োডোফর্মের গন্ধ বেমালুম মিশে গেছে তাঁর নাসা রন্ধ্রে।)— যাক্ তোমার মাথাটাকে চাঙ্গা করবার জন্যে আমার বায়োকেমিক বিধান হচ্চে Kali Phos 6^x^ (কেলিফস)। পূর্ব্বের ওষুধের সঙ্গে সঙ্গেই চলবে, দিনে পাঁচটা বড়ি অন্তত তিনবার সেবনীয়। রবীন্দ্রনাথ

৪০

২৮ জুলাই ১৯৪০

ওঁ

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

তোমার বায়োকেমিক বন্ধুর[১] উদ্দেশে একখানা প্রশস্তিপত্র লিখে পাঠালুম। এখানে তোমার যে বন্ধুটি[২] আমার সিংহদ্বার আগলিয়ে থাকেন— ইংরেজিতে লেখবার জন্যে তোমার হয়ে তিনি আমাকে তাগিদ জানালেন। গৌড়ীয় সাহিত্যমণ্ডলীর প্রতিনিধি আমি— এমন দুর্নীতির কাজ পারৎপক্ষে করিনে। আমার পক্ষে এর পরিণাম ভালো হবে না আমার কলমের মুখে এরকম বিধার্মিক কালী পড়াতে আমি লজ্জিত আছি। যদি এতে কারো কোনো উপকার হয় ভেবে এই অনাচার মেনে এলুম।

তোমার কাজের মহলে একটা ডাক্তারি খিড়কির দরোজা হঠাৎ খুলে গেল[৩]— এর জন্য দায়ী আমি। আশা করি কোনো পরিতাপের কারণ ঘটবে না। ভালো আছ বলে আন্দাজ করচি। চুপচাপ থাকাটা একটা খবর— ওটা আরো কিছুদিন বড়ো হেডলাইনে জাহির কোরো।

আমার দিন চলবে একঘেয়ে সুরে, অবন্ধুর পথে। ইতি
২৮/৭/৪০

রবীন্দ্রনাথ

৪১
১০ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

ওঁ

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

শরীরটা অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন। তোমার বই দুটি পেয়েছি।[১] চোখ সুস্থ হলে পড়ব। কিছুতে মন দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হয়েছে। অক্টোবরের আরম্ভে পাহাড়ে পালাবার ইচ্ছা করচি।[২] যাবার মুখে কলকাতায় দেখা হতে পারবে। নইলে তুমি যদি এখানে এসো সেও একটা উপায় আছে। ইতি ১০/৯/৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪২
২৮ মে ১৯৪১

ওঁ

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN, BENGAL

২৮/৫/৪১

কল্যাণীয়েষু

সজনী, গল্পসল্প[১] তোমার ভালো লেগেছে শুনে আমি খুশী হলুম। ও রকম খুচরো গল্প সাধারণত কারো কানে পৌঁছয় না, কিছু

পাশ-কাটিয়ে চলে যায়। তুমি যে তার ঠিক মর্মটি ধরতে পেরেছ এতে তোমাকে সাহিত্যের সমজদার বলে চেনা গেল।

তোমার শরীর অসুস্থ এর মধ্যে তুমি যে এই লেখায় মন দিতে পেরেছ এ খুব আশ্চর্যের বিষয়। তুমি রোগের হস্ত হোতে নিষ্কৃতি লাভ করো, আমি এই কামনা করি। ইতি

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৩

৪ জুন ১৯৪১

'UTTARAYAN'
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

সজনী, তুমি ক্ষণকালের জন্য এসে আমাদের খুশী করে দিয়ে গেছ।[১] তোমার যে রকম ভঙ্গুর অবস্থা তাতে আমি এ প্রত্যাশা করিনি। প্রতীক্ষা করে রইলুম সুস্থ অবস্থায় আবার সম্মিলন হোতে পারবে। আমি আজ অপেক্ষাকৃত কিছু ভালো আছি। তোমার মাড়ওয়ারী বন্ধুরা[২] খুশি হয়ে গেছেন, সেটা নানা কারণে আনন্দের বিষয়। এই বর্ষার দিনে তাতে সুধাকান্তের মনকে অন্তরে অন্তরে মুখরিত করে তুলেছে। আশা করি সদলবলে ঘরে সুস্থ অবস্থায় ফিরতে পেরেছ এবং গৃহিণীর ভর্ৎসনা দুঃসহ হয়নি। ইতি ৪/৬/৪১

শুভানুধ্যায়ী

রবীন্দ্রনাথ

সুধারানী দাসকে লিখিত
রবীন্দ্রনাথের পত্র

১
১৬ মে ১৯৩৪

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার নববর্ষের প্রণাম পেয়েছি[১], তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

এই মাসের শেষভাগে আমি সিংহলে যাত্রা করব। কলকাতা হয়ে যেতে হবে। তখন সজনীকান্ত যদি কলকাতায় থাকেন তা হলে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তোমাকে হয় তো আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসবেন।

বৎসরের আরম্ভে নানা ব্যাপারে আমাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৪১

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উমারানী দাসকে প্রদত্ত
রবীন্দ্রনাথের অটোগ্রাফ কবিতা

১
৬ নভেম্বর ১৯৩৮

"হায়, গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা। [১]
ওগো তপন, তোমার স্বপন দেখি যে,
করিতে পারিনে সেবা।"

শিশির কহিল কাঁদিয়া,
"তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হে রবি, এমন নাহিক আমার বল,
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন
কেবলি অশ্রুজল।"

"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে পারি যে ভালো।"—

শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া,
"ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি;
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি।"

হে উষা, নিঃশব্দে, এসো, আকাশের তিমির গুণ্ঠন [২]
করো উন্মোচন।
হে প্রাণ, অন্তরে থেকে মুকুলের বাহ্য আবরণ
করো উন্মোচন।
হে চিত্ত, জাগ্রত হও, জড়ত্বের বাধা নিশ্চেতন
করো উন্মোচন।
ভেদবুদ্ধি তামসের মোহ যবনিকা, হে আত্মন
করো উন্মোচন॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬/১১/৩৮

সৌজন্যে : শ্রীমতী উমারানী দাসের সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত।

প্রসঙ্গ কথা-১

সজনীকান্ত দাস

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সজনীকান্ত দাসের পত্রাবলী

১
৭ মার্চ ১৯২৭

১/১ য়ুরোপীয়ান এসাইলাম লেন
কলিকাতা
২৩ শে ফাল্গুন, ১৩৩৩

শ্রীচরণকমলেষু,
প্রণামনিবেদনমিদং

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাঙলাদেশে এক ধরণের লেখা চল্‌ছে[১], আপনি লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বেন। প্রধানত 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' নামক দুটি কাগজেই এগুলি স্থান পায়। অন্যান্য পত্রিকাতেও এ ধরণের লেখা ক্রমশঃ সংক্রামিত হচ্ছে। এই লেখা দুই আকারে প্রকাশ পায় —কবিতা ও গল্প। কবিতা ও গদ্যের যে প্রচলিত রীতি আমরা এযাবৎকাল দেখে আস্‌ছিলাম লেখাগুলি সেই রীতি অনুসরণ ক'রে চলে না। কবিতা, Stanza, অক্ষর, মাত্রা অথবা মিলের কোনো বাঁধন মানে না; গল্পের form সম্পূর্ণ আধুনিক। লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেম্‌নি উচ্ছৃঙ্খল। যৌনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরণের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। যাঁরা লেখেন তাঁরা Continental Literature এর দোহাই পাড়েন। যাঁরা এগুলি প'ড়ে বাহ্‌বা দেন তাঁরা সাধারণ প্রচলিত সাহিত্যকে রুচিবাগীশদের সাহিত্য ব'লে দূরে সরিয়ে রাখেন। পৃথিবীতে আমরা স্ত্রী-পুরুষের যে-সকল পারিবারিক সম্পর্ককে সম্মান ক'রে থাকি এই সব লেখাতে সেই সব সম্পর্কবিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে আমাদের ধারণাকে কুসংস্কার শ্রেণীভুক্ত ব'লে প্রচার কর্‌বার

একটা চেষ্টা দেখি। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই শ্রেণীর লেখকদের অগ্রণী। Realistic নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ব'লে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নরেশবাবুর কয়েকখানি বই, 'কল্লোলে' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হ'ল উতলা' নামক একটি গল্প, 'যুবনাশ্ব' লিখিত কয়েকটি গল্প, এই মাসের (ফাল্গুন) কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটি, 'কালি-কলমে' নজরুল ইস্‌লামের 'মাধবী প্রলাপ' ও 'অনামিকা' নামক দুটি কবিতা ও অন্যান্য কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। আপনি এসব লেখার দু'একটা প'ড়ে থাক্‌বেন। আমরা কতকগুলি বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও নাটকের সাহায্যে 'শনিবারের চিঠিতে'[২] এর বিরুদ্ধে লিখেছিলাম। শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়ও এর বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু এই প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ এত ক্ষীণ যে, কোনো প্রবলপক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধ'রে বাংলা সাহিত্যকে রূপে রসে পুষ্ট ক'রে আস্‌ছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্যপথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত কর্‌ছি।

আমি জানি না, এই সব লেখা সম্বন্ধে আপনার মত কি। নরেশবাবুর কোন বইয়ের সমালোচনায় আপনি তাঁর সাহসের প্রশংসা করেছেন। সেটা ব্যাজস্তুতি না সত্যিকার প্রশংসা, বুঝ্‌তে পারিনা। আমি নিজে এগুলিকে সাহিত্যের আগাছা ব'লে মনে করি। বাঙলা সাহিত্য যাথার্থ রূপ নেবার পূর্ব্বেই এই ধরণের লেখার মোহে প'ড়ে নষ্ট হ'তে বসেছে, আমার এই ধারণা। সেইজন্যে আপনার মতামতের জন্যে আমি আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি। বিরুদ্ধে বা পক্ষে যে দিকেই আপনি মত দেন, আপনার মত সাধারণের জানা প্রয়োজন।

আপনাকে আজ এই চিঠি লেখার একটি কারণ—(কার্ত্তিকের) ভারতীতে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবন্ধ "সাহিত্যে শুচিবিকার।" এই প্রবন্ধটিকে এই সম্প্রদায়ের লেখকগণ ইতিমধ্যেই নজির স্বরূপ দাখিল করেছেন। সেই প্রবন্ধটি আমি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

আজ দশ বৎসর ধ'রে আপনার লেখা প'ড়ে আমার ধারণা হয়েছে আপনি সাহিত্যে শ্লীলতার গণ্ডী পার হ'য়ে যাওয়ার পক্ষে নন। আপনার লেখার এমন কোনো জায়গা আমি দেখিনি যেখানে আপনার চিত্রিত চরিত্র সংযম হারিয়েছে। ঠিক যতটুকু পর্য্যন্ত যাওয়া প্রয়োজন, ততটুকুর বেশী আপনি কখনও যাননি। অথচ যে-সব জিনিষ নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন সেই সব জিনিষই আধুনিক এই লেখকদের হাতে পড়লে কি রূপ ধারণ কর্‌ত ভাব্‌লে শিউরে উঠতে হয়। 'একরাত্রি', 'নষ্টনীড়' ও 'ঘরে বাইরে' এরা লিখ্‌লে কি ঘট্‌ত— ভাব্‌তে সাহস হয় না।

নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনের' প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সম্ভবত আপনি নিজে 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' লিখেছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'উমা' নামক উপন্যাসের সমালোচনায় তাতে লিখিত আছে —"সুনীতির হিসাবে এ গ্রন্থের প্রশংসা করিতে পারি না। বিনোদিনী ও যোগেশ্বর সম্বলিত যে চিত্র গ্রন্থকার আমাদিগকে দেখাইয়াছেন তাহা অস্বাভাবিক নহে— এমন অবস্থায় এমন ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটে। কিন্তু পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে তাহাই যে কাব্যে অঙ্কিত করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই।... কেবল কি পাপচিত্র আঁকিবার জন্যই পাপচিত্র আঁকা? তাই আবার পাঁচকড়িবাবুর ন্যায় ক্ষমতাশালী লেখকে করিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য!... যাহাতে বিশ্বজনীন নীতি নাই, তাহা কি কাব্য হইতে পারে?"

১৯॥৫

এই চিঠির উত্তর পাওয়ার সৌভাগ্য যদি আমার হয় তা'হলে সেটি প্রকাশ কর্‌বার অনুমতি আমি আপনার কাছে চেয়ে রাখছি।

আপনার নিকট এভাবে জবাব দাবী কর্‌তে গিয়ে যদি কিছু ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রে থাকি তা'হলে এই ভেবে ক্ষমা কর্‌বেন যে, আমি একা নই— আমার এই চিঠিতে আমি অন্ততঃ আমার পরিচিত কুড়ি বাইশ জন সাহিত্যসেবীর মনোভাব ব্যক্ত করেছি। ক্ষুদ্র লেখকের লেখনীতে সত্য প্রতিবাদও অনেক সময় ঈর্ষ্যা ব'লে হেলা পায়। আপনি কথা বল্‌লে আর যাই বলুক, ঈর্ষ্যার অপবাদ কেউ দেবে না।

আমার প্রণাম জানবেন।

প্রণতঃ শ্রীসজনীকান্ত দাস

২

১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭

The Modern Review
91, Upper Circular Road, Calcutta
13. 12. 1927

শ্রীচরণেষু,

সাপ্তাহিক আত্মশক্তির[১] কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত আপনার 'নটরাজ'[২] গীতি নাট্যখানির সমালোচনা লইয়া কিছুদিন যাবৎ গোপনে ও প্রকাশ্যে একটু আন্দোলন চলিতেছিল, পরম্পরায় তাহার আভাস পাইয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আপনার নিকট আমার কিছু জবাবদিহি করিবার আছে কিনা ভাবিয়া তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া এতকাল আপনার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই বা পত্র লিখি নাই। কিন্তু

গত পরশু ও কাল শ্রীযুক্ত প্রশান্তবাবুর[৩] সহিত দুই একটি কথাবার্ত্তার ফলে আমি বুঝিয়াছি যে অবিলম্বে আপনার নিকট আমার নিজের দিকটা খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক, নতুবা, আমার সহিত অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জড়াইয়া অকারণে তাহাদের ক্ষতি করার চেষ্টা চলিতে পারে।

সমালোচনাটি শ্রীঅরসিক রায় এই বেনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। অরসিক রায় একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির গুপ্তনাম। সে আমার পরিচিত ও চাকরী সম্পর্কে 'আত্মশক্তি'র সহিত তাহার পরোক্ষ যোগ আছে। 'নটরাজে'র এই সমালোচনাটি উক্ত অরসিক রায়ের লেখা নহে। উহা আমার লেখা। আমার লিখিত প্রবন্ধের দুই একস্থল আমার অজ্ঞাতসারে বর্জ্জন করিয়া ও স্থল বিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়া অনেক মুদ্রাকর প্রমাদ সমেত উহা অরসিক রায়ের নামে বাহির হইয়াছিল। অরসিক রায়ের নামের আড়ালে আমি সেকারণেই আত্মগোপন করিয়া থাকি, ভাবিয়াছিলাম, ওই নামটিই ওই প্রবন্ধ সম্পর্কে অন্য আলোচনার অবকাশ দিবে না। কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি, বাংলাদেশে লেখার দ্বারা লেখার বিচার হয় না ; লেখকের কুলজী কোষ্ঠীরও প্রয়োজন হয়। এ দেশের লোকেরা সত্য-অনিসন্ধিৎসু [অনিসন্ধিৎস], গোপনতম সত্যটি তাহারা টানিয়া বাহির করিবেই। কারণ, কোনো বিশেষ বস্তুর উপর স্বকপোল-কল্পিত বিশেষ উদ্দেশ্যটি আরোপ করিতে না পারিলে তাহাদের সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখানো হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। আমার এই লেখাটির ভিতর আমার বা অপর কাহারো একটা উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য মস্তিষ্কবান ব্যক্তিরা যে সচেষ্ট হইয়াছেন তাহার পরিচয় পাইয়াছি। অতএব লেখাটির ইতিহাস আগাগোড়া আপনাকে শোনানো আবশ্যক।

আমি শুনিয়াছি, আপনি এই লেখাটির সম্পর্কে এক বা একাধিক পত্র পাইয়াছেন। তাহার একটিতে নাকি লেখা আছে, আমি

শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারের প্ররোচনায় ওই প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম। সেই চিঠিতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সাক্ষী মানা হইয়াছে। হয়ত অন্য চিঠিতে কিম্বা মৌখিক ইহাও কেহ বলিয়া থাকিবেন যে, যেহেতু আমি 'প্রবাসী' অফিসের বেতনভোগী কর্ম্মচারী এবং যেহেতু 'বিচিত্রা' পত্রিকা ব্যবসায় ক্ষেত্রে 'প্রবাসী'র প্রতিদ্বন্দ্বী সেই হেতু শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিম্বা তাঁহার সম্পর্কিত কেহ আমাকে দিয়া ওই প্রবন্ধ লিখাইয়া বিচিত্রাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ গুজব ইতিপূর্ব্বে শুনিয়া না থাকিলেও হয়ত অচির ভবিষ্যতে শুনিতে পাইবেন। সেইজন্য আপনাকে জানাইতেছি যে আমার লিখিত উক্ত সমালোচনাটিতে সত্য, মিথ্যা, বাতুলতা, প্রলাপ, ঔদ্ধত্য, ঈর্ষা যাহা কিছু আছে তাহা সম্পূর্ণ আমার— অন্য কাহারও তাহাতে বিন্দুমাত্র অংশ বা প্রভাব নাই। যদি কেহ বলেন, আমি অন্যের প্ররোচনায় লিখিয়াছি তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন। আমি নিজের তরফ হইতে এইটুকু মাত্র বলিতে চাই যে, বিগত পঞ্চদশ বর্ষকাল রবীন্দ্র সাহিত্যের সহিত পরিচিত থাকার দরুন আমি সাহিত্য বিষয়ে এই ধর্ম্মটুকু অর্জ্জন করিয়াছি যাহার প্রভাব সাহিত্যিক নীচতা ও হীনতা হইতে আমাকে বিরত করে অন্তত, ভাড়াটে সাহিত্যিক গুণ্ডা হইতে আমাকে বাধা দেয়।

'নটরাজে'র সমালোচনা লিখিয়া ও বেনামীতে যতবড় অপরাধই আমি করিয়া থাকি তাহার শাস্তি সম্পূর্ণ আমারই প্রাপ্য। যাঁহারা আমাকে অন্নদান করেন তাঁহারা পাপভাগী নহেন। ওই সমালোচনাটি সম্ভবত —আপনি এখনও পড়েন নাই; যদি পড়িয়া থাকেন ও উহা আপনাকে বিন্দুমাত্রও ব্যথা দিয়া থাকে তজ্জন্য আমি আপনার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবার দাবী রাখি। কিন্তু, আপনার বিরুদ্ধে আমারও নালিশ এই যে, বেনামী চিঠি পড়িয়া প্রবন্ধটি সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা যখন

আপনার হইয়াছিল তখন সর্ব্বাগ্রে আমার নিকট হইতেই তাহা জানা আপনার উচিত ছিল। আমি বোধহয় আপনার নিকট মিথ্যা বলিতাম না। বিশ্বভারতীর সম্পর্কিত কোনও একজন আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, 'নটরাজে'র সমালোচনা বাহির হইবার পরও আমি যখন দুই দুইবার আপনার সহিত দেখা করিতে যাই, তখন আপনার নিকট উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোনও কথা বলি নাই কেন? কিন্তু আমার সহজ বুদ্ধি বলিতেছে যে, বলিবার কোনো কারণ ঘটে নাই। উপযাচক হইয়াও কথা বলিতে গেলে আপনিই আমাকে 'অতিরসিক' সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করিতেন। ওই প্রবন্ধ লিখিয়া আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা স্তাপন করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা যদি আমার থাকিত তাহা হইলে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম না। আমি নিজের মধ্যে সেই শক্তি অনুভব করি যাহা আমাকে সংসারে মাথা নীচু করিয়া অপরাধীর মত চলিতে দেয় না। আমি হয়ত ভুল করিতে পারি কিন্তু নীচতা যে দেখাই নাই এটুকু দয়া করিয়া বিশ্বাস করিবেন।

যে রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে বেনামীতে মেঘনাদবধের সমালোচনা লিখিয়াছিলেন, যিনি বয়সের তারতম্য ভুলিয়া গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত সত্যের খাতিরে দ্বন্দ্ব করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর নন্‌কোঅপারেশন আন্দোলনের সময় দেশব্যাপী নৈতিক ভয় দূর করিবার জন্য 'সত্যের আহ্বান' করিয়াছিলেন তিনিই যদি আজ লোকে স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করে দেখিয়া গোপন অনুসন্ধান ও হীন চরবৃত্তির প্রশ্রয় দেন তাহা হইলে দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

দৈব দুর্ব্বিপাকে প্রবাসী ও শনিবারের চিঠির সহিত আমি যুক্ত বলিয়াই কি আমার নিজস্ব মতামত সমস্তই প্রবাসী ও শনিবারের চিঠির মতামত? আমি একেলা প্রবাসী অথবা শনিবারের চিঠি নহি। সৌভাগ্যের বিষয় নব পর্য্যায় শনিবারের চিঠি প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত

হইবার ঠিক দেড়মাস পূর্ব্বে 'নটরাজে'র সমালোচনাটি লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং মাসিক শনিবারের চিঠি[র] সহিত ইহার যে কোনো যোগ নাই তাহা প্রমাণ করিতে পারিব। আর প্রবাসীর বিষয়ে আমি এইটুকু বিশ্বাস করি যে প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয়কে আপনি এত ভালো করিয়া জানেন যে প্রবাসীর সহিত এই প্রবন্ধের সম্পর্ক পাতাইয়া যে জনরবের সৃষ্টি হইতেছে তাহার কদর্য্যতাও আপনি বুঝিতে পারিবেন। বাংলাদেশের মানুষকে আপনি ৬৭ বৎসর ধরিয়া দেখিতেছেন। আমার ভয় হয় পাছে যাঁহারা নিরন্তর আপনাকে ঘিরিয়া থাকেন তাঁহাদের মতামতের ফেরে পড়িয়া আপনি ভুল করেন।

'নটরাজ' গীতিনাট্য আষাঢ় মাসের বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। ওই মাসের শেষের দিকে আমার প্রবন্ধ লিখিত হয়। আমার পরিচিত কয়েকজন সাহিত্যরসিক বন্ধুকে উহা পড়িয়া শোনাই। তাঁহারা প্রবন্ধটিতে আপনার প্রতি কোনো অসম্ভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে এরূপ মনে করেন নাই। সুতরাং প্রবন্ধটি ছাপাইবার পক্ষে আমি কোনো বাধা দেখি না। প্রবন্ধটি প্রকাশ করিবার জন্য দুই এক জায়গায় চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হই নাই। আমার এক বন্ধু শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উহা আমার নিকট হইতে লইয়া অন্য কাহারও লেখা বলিয়া 'কালিকলম' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দেয়। 'কালিকলম' সম্পাদক মুরলীধর বসু মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ে উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাঁহারা প্রবন্ধটি সুলিখিত ও ছাপিবার উপযুক্ত এই মত প্রকাশ করেন। কিন্তু কালিকলম সম্পাদকের নিকট হইতে নানাকারণে আমি লোক পাঠাইয়া প্রবন্ধটি ফেরৎ লই। প্রবন্ধটি যে আমার লেখা তাহা তাঁহাদিগকে (কালিকলম) জানানো হয় নাই, তাঁহারা আঁচে বুঝিয়া থাকিবেন। ইহার পর প্রবন্ধটি পড়িয়া থাকে, আমি উহা প্রকাশের কোনো চেষ্টা করি নাই।

কিছুদিন পরে আমার পরিচিত উক্ত অরসিক রায় প্রবন্ধটি শুনিয়া বলে যে যদি আমি প্রবন্ধটি তাহার নামে (অর্থাৎ অরসিক রায় এই নামে) ছাপিতে অনুমতি দিই তাহা হইলে সে 'আত্মশক্তি'তে তাহা ছাপাইতে পারে। আমি তাহাতে আপত্তি করিবার কোনো কারণ দেখি না। ফলে ৯ই ভাদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ৫ সংখ্যা 'আত্মশক্তি'তে প্রবন্ধটি বাহির হয়। নব পর্য্যায় শনিবারের চিঠি প্রথম সংখ্যা ১৩ ভাদ্র বাহির হয়।

ইহাই হইল প্রবন্ধ প্রকাশের ইতিহাস। ইহার মধ্যে কাহারো কোনো প্ররোচনা বা আমার নিজেরও কোনো 'মতলব' ছিল না। আমি এরূপই জানিতাম। এখন দেখিতেছি প্ররোচনা একের নহে, অনেকের ছিল এবং আমারও বহু 'মতলব' নিশ্চয়ই ছিল, নতুবা আমি প্রবাসী অফিসে চাকুরী করিয়া ওরূপ প্রবন্ধ লিখিব কেন? শনিবারের চিঠির সহিতই বা যুক্ত থাকিব কেন?

আমার এই ২৬ বৎসরের জীবনে মানুষকে ভাল করিয়া চিনিবার অবকাশ পাই নাই, সুতরাং ভুল করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। আপনি বহু বর্ষ যাবৎ এই পৃথিবীর হালচাল দেখিয়া আসিতেছেন, আপনি ভুল করিবেন না এ বিশ্বাস আমি করিতে পারি। আপনার অনেক ভক্ত আছে। কেহ কাছে থাকিতে পায়, কেহ পায় না। দূরে যাহারা থাকে তাহাদেরও ভক্তি বিন্দুমাত্র কম নহে। অন্ততঃ, আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ এবং এতকালের খোরাকও তিনিই জোগাইতেছেন। আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেন তাহা হইলেই আমার চরমতম শাস্তি ঘটিবে। আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অন্ততঃ সেই শাস্তিটুকু হইতে আমাকে রেহাই দিবেন।

আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি প্রণতঃ শ্রীসজনীকান্ত দাস

৩

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫/২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা
৫. ৯. ৩৮

শ্রীচরণেষু,

মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বি. আর. সেনের পত্র অনুযায়ী আপনি যে স্বস্তিবচন লিখিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন তাহা এখনও পাই নাই[১]। শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণন আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর [২৪ ভাদ্র ১৩৪৫] শনিবার প্রাতে বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিবেন। আপনার স্বস্তি-বচন সর্বাগ্রে পঠিত হইবে। আমরা শুক্রবার বৈকালে মেদিনীপুর রওয়ানা হইব ; আপনার লেখাটি যদি কাল-পরশুর মধ্যে পাঠাইয়া দিবার নির্দ্দেশ দেন, তাহা হইলে ভাল হয়। উহা বাঁধাইয়া স্মৃতি-মন্দিরে টাঙানো হইবে, সুতরাং বড় কাগজে বড় বড় অক্ষরে একটু বেশী লেখা আশা করিতেছি।

আর একটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কথা আপনাকে মুখে জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলাম। দূরে আসিয়া লোভ সামলাইতে পারিতেছি না। আশ্বিন মাস হইতে আমার সম্পাদনায় 'অলকা' নামে একটি মাসিক পত্র বাহির হইবে ; পত্রিকাটির আর্থিক দায়িত্ব সার এন. এন. সরকারের[২] এক পুত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের। এটিকে সিনেমা এবং পলিটিক্স বর্জ্জিতভাবে সম্পূর্ণ সাহিত্য পত্রিকা করিবার ইচ্ছা আছে, ঠিক 'অমনিবাস' ধরণের পত্রিকাও হইবে না। আপনার 'মুক্তির উপায়' নাটিকাটি শুনিয়া অবধি উহা দিয়াই পত্রিকা সুরু করিবার অত্যন্ত লোভ হইয়াছে। আমি খুব মনোযোগের সহিত উহা শুনিয়াছি এবং

অত্যন্ত জোরের সঙ্গে আপনাকে বলিতেছি যে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম অথবা ওই জাতীয় কোনও প্রতিষ্ঠান সকল ত্রুটি ও শৈথিল্য সত্ত্বেও আপনার আক্রমণ গায়ে পাতিয়া লইয়া আন্দোলন করিবে না। আপনার রচনাটি অনাবিল হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়া সাধারণভাবে গুরুগিরির বিরুদ্ধে একটা ইঙ্গিতমাত্র করে ; উহাতে কাঁটা বা ঝাল নাই। নাটিকাটির প্রকাশে আপনার বিরুদ্ধে কোনও দিক দিয়া ক্ষোভের উদয় হইবে না, ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি। বাঙালী পাঠক বা শ্রোতা হাসিবার অবকাশ বড় বেশী পায় না, এই নাটিকাটিতে আপনি দুতিন ঘণ্টার জন্য যে নির্ম্মল হাসির খোরাক জোগাইয়াছেন, অনির্দ্দিষ্ট এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যক্তিকে আঘাত হইতে বাঁচাইতে গিয়া বাঙালী জাতিকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকার আপনার নাই। উহার প্রকাশের দাবী আমি অকুণ্ঠিত মনে আপনাকে জানাইতেছি। 'অলকা'কে যদি কৃপা করা সম্ভব হয়, আমি যথাসম্ভব সুন্দর করিয়া ছাপিব এবং অন্যান্য কথা কিশোরীদার[৩] সহিত ঠিক করিয়া লইব। ইহার জন্য যদি আপনি প্রয়োজন বোধ করেন, আমি পুনরায় শান্তিনিকেতন যাইতে পারি।

'মুক্তির উপায়' যদি না হয় তাহা হইলে 'অলকা'র প্রথম কয়েক পৃষ্ঠার জন্য আপনার অন্য কোনও রচনা প্রার্থনা করিতেছি ; আশা করি বঞ্চিত হইব না। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে কাগজ বাহির করিতে হইবে, অবিলম্বে ছাপা সুরু করা আবশ্যক। আপনার একটা কথা না পাইলে আমি তাহা করিতে পারিতেছি না।

আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি প্রণতঃ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

৪
১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮
* ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

VISVA-BHARATI
210, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA

Phone REGENT 537. 14. 9. 1938

শ্রীচরণেষু,

'মুক্তির উপায়' এখনও পাই নি, বড্ড ভাবিত আছি।

আজ আপনার নামে আমার 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে'র ২য় অংশ পাঠিয়েছি। আশাকরি, অবসর মত দেখবেন।

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি
প্রঃ শ্রীসজনীকান্ত দাস

Dr. Rabindranath Tagore
Santiniketan P.O.
Bribhum
(E I Rly Loop)

৫
২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫/২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা
২৬. ৯. ৩৮

শ্রীচরণেষু,

আজ দু কপি 'অলকা' আপনার নামে পাঠান হয়েছে। আর কয় কপি চাই আমাকে জানিয়ে দেবেন।

'বাংলা কাব্য পরিচয়ে'র কাজ আরম্ভ করেছি। একমেটে নির্বাচন হলেই একবার আপনাকে দেখিয়ে আসব[১]। আশ্বিন সংখ্যা 'কবিতা' ত্রৈমাসিকে[২] বুদ্ধদেব বাংলা কাব্য পরিচয়ের একটা আলোচনা করেছেন। ওতে আমাদের কিছু সাহায্য হবে।

আপনি কি সমস্ত ছুটিটাই বোলপুরে থাকবেন?

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি প্রণতঃ শ্রীসজনীকান্ত দাস

৬

৩০ অক্টোবর ১৯৩৮

২৫/২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা
৩০. ১০ ৩৮

শ্রীচরণেষু,

সুধীদার[১] নির্দ্দেশমত আমরা[২] আগামী শনিবার[৩] সন্ধ্যায় যাওয়াই স্থির করিয়াছি, রবিবার সকালে আপনার সহিত দেখা হইবে।

১৫০ টাকার একটি চেক এই সঙ্গে পাঠাইলাম। 'অলকা'র যৎসামান্য মাসিক বরাদ্দ হইতে আপনার উপযুক্ত দক্ষিণা জোগাইতে পারিলাম না বলিয়া সঙ্কুচিত আছি।

আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি প্রণতঃ শ্রীসজনীকান্ত

পুঃ অনেক কথা লিখিতে ইচ্ছা হয়, বহুদিন রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে বহু প্রশ্নও মনে জমা হইয়া আছে কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য স্মরণ করিয়া সংযত হইতে হয়। এও এক দুর্ভাগ্য!

রবীন্দ্রনাথ, সজনীকান্ত, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৫ নভেম্বর ১৯৩৮, শান্তিনিকেতন।
শম্ভু সাহা গৃহীত আলোকচিত্র শ্রীমতী উমারানী দাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৭
২ নভেম্বর ১৯৩৮

২৫/২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা
২/১১/৩৮

শ্রীচরণেষু,

নাচনের চিঠির নকল যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি। আসলটা আমি ব্যবহার করছি।[১]

শনিবার বেলা বারোটায়[২] আমরা[৩] শান্তিনিকেতন পৌঁছব। সুনীতি বাবু[৪] নিগ্রো আর্ট সম্বন্ধে একটা সচিত্র বক্তৃতা ওখানকার ছেলেদের কাছে দিতে চান। স্লাইড প্রস্তুত আছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা করবার জন্যে আমি নন্দবাবুকে[৫] আজ চিঠি দিলাম।

আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি প্রঃ শ্রীসজনীকান্ত

৮
১০ নভেম্বর ১৯৩৮

VISVA-BHARATI BOOK-SHOP

Telephone
REGENT-537

210, CORNWALLIS STREET
CALCUTTA
১০. ১১. ৩৮

শ্রীচরণেষু,

আপনাকে অসুস্থ দেখে এসেছি[১], খুব চিন্তিত আছি। আমি কাব্যপরিচয়ের মধ্যযুগ সম্পূর্ণ করে এনেছি, এবার আদিযুগ শেষ

হলেই কিশোরীদাকে[২] কপি দেব। রবীন্দ্রোত্তর যুগের একটা খসড়া নিয়ে আপনার ঢ্যাঁড়াসই নিয়ে আসব, ওখানে আমারও ভয় আছে আমি নিজে ওর মধ্যে আছি ব'লে[৩]। নিজেকে বাদ দিতে পারলে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম।

'মুক্তির উপায়' মঞ্চায়িত হবার আগে খবর পেলে যাব[৪], নাটকটির সঙ্গে পরোক্ষে আমি কেমন যেন জড়িয়ে গেছি।

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি প্রণত সজনীকান্ত

৯
১৭ নভেম্বর ১৯৩৮

২৫/২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা
১৭. ১১ ৩৮

শ্রীচরণেষু,

কাল,[১] ঢাকা হইতে ফিরিয়া আপনার পত্র[২] পাইয়াছি। এবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার[৩] প্রথম প্রবন্ধ আপনার ভাষা পরিচয়ের ভূমিকা। প্রুফ পাঠাইলাম।[৪] সম্বোধনের জায়গাগুলি একটু বদল করিয়াছি বড় ছোট হইয়াছে। আর একটু বাড়ানো সম্ভব হইলে বড় ভাল হইত।

প্রুফটা শীঘ্র ফেরত পাইলে ভাল হয়।

আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি

প্রণতঃ সজনীকান্ত

১০
৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮

ফোন : বড়বাজার ৬৩৭
শ্রীসজনীকান্ত দাস

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫/২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা
৩/১২/৩৮

শ্রীচরণেষু,

আপনার মার্জ্জিনাল-মন্তব্য[১] সমেত আপনার নিকট এলাহাবাদের কোনও পত্রলেখিকার পত্রের প্রথমাংশ হস্তগত হ'ল। 'কাব্য পরিচয়' সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানা রইল। তবে সুরেন্দ্রনাথ সেন[২], গুরুসদয় দত্ত[৩] হজম হবে না।'ছোট-গল্প-পরিচয়' লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় বেশ ভালই হবে, তাতেও বিপদ কম নয়। সুফিয়া হোসেনের কবিতা দেখছি।[৪]

আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হচ্ছে। আগামী মঙ্গলবারে[৫] আমাদের নির্ব্বাচন সমিতির দরবারে পেশ করে তাঁদের অনুমতি পেলে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি নিয়ে আপনাকে দেখিয়ে আসব।

'কাব্য-পরিচয়' ব্যাপারে একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করছি, যারা সত্যিকার কবিতা লিখতে পারে না তারাই ক্ষেপেছে বেশী।

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি প্রণতঃ শ্রীসজনীকান্ত

পুঃ আপনার ইংরেজীতে ছাপা সমস্ত চিঠিগুলো বিশেষ প্রয়োজনে আমার দরকার। অথচ কলকাতার বাজারে বা বিশ্বভারতীর অফিসে পেলাম না। কিছুদিনের জন্যে ওখান থেকে আনানো কি সম্ভব হবে?

কিশোরীদার[৬] মুখে শুনলাম মাসীমার[৭] কাছে লেখা আপনার চিঠি ছাপা হচ্ছে। আসলে চিঠির ওপর খুব বেশী অত্যাচার করবেন না, এই আমার অনুরোধ।

১১
১৩ অক্টোবর ১৯৩৯

২৫/২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা
১৩. ১০. ৩৯

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র[১] পেয়েছি। মেদিনীপুরের ব্যাপার[২] নিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতেই কথা বল্‌ব।

কার্ত্তিক সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে[৩] "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী" সুরু করেছি। আজ আপনাকে এক সংখ্যা পাঠিয়েছি। আপনি একবার পড়ে দেখবেন। যদি কোথাও কোনও অসঙ্গতি থাকে জানতে পারলে সংশোধন করব। ভারতী, বালক, প্রচার, নবজীবন, সাধনা, বঙ্গদর্শন, ভাণ্ডার, সবুজপত্র, প্রবাসী— এর প্রত্যেকটিতেই আপনার লেখা আছে, অথচ নাম নেই, সেগুলির তালিকা এক জায়গায় করাই আমাদের বড় কাজ। সুতরাং আপনার দেখাটার ওপর এত জোর দিচ্ছি।

আপনি কবে নাগাদ কলকাতা আসতে পারবেন জান্‌তে পারলে সেসময় আমি কলকাতায় থাকব।[৪]

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি প্রণতঃ শ্রীসজনীকান্ত

১২
[১৭ অক্টোবর ১৯৩৯]

Sanibarer Chithi

25/2 Mohan Bagan Row
Calcutta
[১৭. ১০ ৩৯]

[শ্রীচরণেষু]

সেই সময়ের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ঘাঁটিয়া দেখিতেছি, ১৭৯৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পরবর্তী ছয় সংখ্যায় "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র"[১] নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম নয় কল্পে জ্যোতিষ-বিষয়ে অন্য কোন প্রবন্ধ নাই। ১৭৯৫ শকের জ্যৈষ্ঠ মাস ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আপনি আপনার পিতৃদেবের সহিত ড্যালহৌসি পাহাড়ে ছিলেন। সুতরাং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়া থাকিলে এই সুবৃহৎ প্রবন্ধই আপনার লিখিত প্রথম গদ্য-প্রবন্ধ —'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫ তারিখে প্রকাশিত আপনার নামাঙ্কিত সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা "হিন্দু মেলার উপহার" কবিতারও প্রায় দুই বৎসর পূর্বে ইহা মুদ্রিত। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া দেখিতেছি, ইহা ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ কোনও প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তির লেখা— পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্রের সহিত তুলনামূলক বহু আঙ্কিক সিদ্ধান্তও ইহাতে আছে। তৎকালে অঙ্কে আপনি এতখানি পাকা থাকিলে পরবর্তীকলে কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা নিশ্চয়ই পাইতাম না।...

[সজনীকান্ত দাস]

১৩
২৯ নভেম্বর ১৯৩৯

Sanibarer Chithi

Phone : By 637
25/2 Mohanbagan Row
Calcutta
২৯ ১১. ৩৯

শ্রীচরণেষু,

আজ সকালে সুধাদার[১] সঙ্গে মেদিনীপুর যাওয়া নিয়ে কথা হল, আপনার ইচ্ছামত বন্দোবস্তই করা হচ্ছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে রাজা ও রাণী ও বিসর্জ্জনের পাঠভেদ দেওয়ার নির্দেশ[২] দিয়েছেন দেখলাম। রাজা ও রাণী প্রথম খণ্ডেই ছাপা হয়ে গেছে, বিসর্জ্জনের পাঠভেদ দিতে গেলে ২য় খণ্ড প্রকাশে দেরী হবে। সুতরাং এখণ্ডটিকে খণ্ডিত করে বের করতে হবে। ভবিষ্যতের খণ্ডগুলি যাতে সম্পূর্ণাঙ্গ হয়ে বের হয় এখন থেকে তার আয়োজন করা উচিত। অনেক দিক ভেবে দেখবার আছে, যেমন গানগুলো কোন্ খণ্ডে কিভাবে দেওয়া উচিত[৩] ; আপনার পরবর্ত্তী যে সব লেখা ভুলক্রমে বর্জ্জিত হয়েছে সেগুলি পরিশিষ্ট-খণ্ডে যাবে না মূল রচনাবলীতে যুক্ত হবে ইত্যাদি। আমার মনে হয়, আপনার সামনে সম্পাদক-সঙ্ঘের একবার মোকাবিলা হওয়া আবশ্যক এবং একটা পাকাপাকি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি খাড়া করে সেই অনুযায়ী তৃতীয় খণ্ড থেকে কাজ হওয়া উচিত। না হলে গোলমাল উত্তরোত্তর বেড়ে চলতেই থাকবে। এই আলোচনা যথাসম্ভব শীঘ্র হলে ভাল হয়।

পরিশিষ্ট খণ্ডগুলির কাজ আমি করছি, কপি অনেকখানি প্রস্তুত হয়েছে।

আপনার আরও অনেকগুলি লেখা বের হয়েছে, সেগুলি এবং ভাণ্ডার বঙ্গদর্শন সাধনা প্রভৃতি পত্রিকাগুলি আপনাকে দেখিয়ে নেওয়া আবশ্যক। কোন্ দিন গেলে আপনার কোনও অসুবিধা হবে না জান্‌তে পারলে আমি হাজির হব। ইতিমধ্যে একটি প্রশ্নের জবাব জানতে পারলে ভাল হত। মানসীর প্রথম সংস্করণের (২য় সংস্করণেরও) ভূমিকায় লেখা আছে..."শেষ উপহার" নামক কবিতাটি আমার কোনো বন্ধুর রচিত. এক ইংরাজি কবিতা অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছি। মূল কবিতাটি এইখানে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল— কিন্তু আমার বন্ধু সম্প্রতি সুদূরপ্রবাসে থাকা প্রযুক্ত তাহা পারিলাম না।" ভূমিকাটি লিখেছিলেন ১৮৯১ সালের জানুয়ারি মাসে। কবিতাটির প্রথম দুই লাইন এই—

আমি রাত্রি, তুমি ফুল। যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি

মূল কবিতাটি কার এবং ওটি কোথায় পাওয়া যেতে পারে জানতে পারলে ভাল হয়।[৪]

বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদঘাটন উৎসবে আপনার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার কথা বলেছিলাম, আপনি চিঠিতে স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছিলেন, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে দুই এক পংক্তি বলা যদি সম্ভব হয় তাহলে রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীনেদেরও কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ ঘটতে পারে।

পরিষৎ প্রকাশিত বঙ্কিম গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে[৫] সামান্য কিছু লিখে দিলে আমরা তা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ করে ছাপতে পারি এবং দৈনিক কাগজেও তা প্রকাশ করে প্রচারের কিছু সুবিধা করতে পারি।

চৈতন্য লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষকে একটা চিঠি দেওয়ার কথা ছিল।

আমার প্রণাম জানবেন। ইতি

প্রঃ সজনীকান্ত

১৪
৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯

Sanibarer Chithi

Phone : Bz 637
25/2 Mohanbagan Row
Calcutta
৫/১২/৩৯

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র[১] এবং আজ বঙ্কিম গ্রন্থাবলী[২] সম্বন্ধে আপনার অভিমত পেলাম। হাওড়ায় গাড়ীতে রবীন্দ্র-রচনাবলী সম্বন্ধে যে বৈঠকের কথা হয়েছিল কলকাতা করপোরেশনের খাদ্য এবং পোষ্টাই প্রদর্শনীর[৩] ঠেলায় তা আর সম্ভব হবে না মনে হচ্ছে।

মেদিনীপুরে[৪] আপনার অভিভাষণটি (আপনার অভিভাষণের পর) কর্ত্তৃপক্ষ ছাপার আকারে বিলি করতে চান ; ছাপবার ভার পড়েছে আমার ওপর সুতরাং সেটি অবিলম্বে পেলে আমি কাজ আরম্ভ করতে পারি।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় একটি অনুবাদ কবিতা আছে, নকল করে পাঠালাম। এ সম্বন্ধে আপনার কি কিছু স্মরণ আছে?[৫]

তারাকদম্বকুসুমান্যবকীর্য্য দিক্ষু
ক্ষেমায় সর্ব্বজগতাং স্বকরৈঃ প্রকাশং।
হিণ্ডীরপাণ্ডবরুচিঃ শসলাঞ্ছনোহয়ং
নীরাজয়ন্ ভুবনভাবন মুজ্জিহীতে।

স্বৈরং শৈলবনাবলীং বিঘটয়ন্ সংক্ষোভয়ন্ সাগরং
প্রধ্বাতৈর্গিরিকন্দরান্ মুখরয়ন্ ব্রহ্মাণ্ডমুদ্বোধয়ন্।

বায়ো ত্বং শুভশঙ্খচামরভবাং প্রীতিং বিধেহি প্রভোঃ
সন্ধ্যামঙ্গলদীপকোঽয়মুদগাৎ ব্যোম্নি স্ফুরত্তারকে।

তারকা-কুসুমচয় ছড়ায়ে আকাশময়
চন্দ্রমা আরতি তাঁর করিছে গগনে।
দুলায়ে পাদপগুলি, সাগরে তরঙ্গতুলি,
জাগাইয়া জগতের জীবজন্তুগণে।

পর্ব্বতকন্দরে গিয়া, শুভ শঙ্খ বাজাইয়া,
পবন হরষে তাঁরে চামর দুলায়।
অগণ্য তারকাবলী চৌদিকে রয়েছে জ্বলি,
মঙ্গলকনকদীপ গগনের গায়॥

গতবারের শনিবারের চিঠিতে "ফের্ডিনা ভেলেসেপ্ এবং সুয়েজের খাল" প্রবন্ধটি সংশয় চিহ্ন সমেত রবীন্দ্র রচনাপঞ্জীর তালিকায় প্রকাশ করেছিলাম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'প্রবন্ধমঞ্জরী' পুস্তকে ওটি স্থান পেয়েছে, সুতরাং সংশয় আর নাই।[৬]

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি প্রণতঃ সজনীকান্ত

আমি ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বোলপুর পৌঁছব।[৭]

টেলিগ্রাম

১৫
* ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৯

Handed at Calcutta
(Office of Origin)

Date/Hour/Minute
14/12/50
Santiniketan

To Rabindranath
Reaching Bolpur this evening everything ready.[১]
Sajani

১৬
১০ জানুয়ারি ১৯৪০

Sanibarer Chithi

Phone : BZ 637
25/2 Mohan Bagan Row
Calcutta
১০/১/৪০

শ্রীচরণেষু,

ইংরেজী স্বত্ববহির্ভূত রচনা সম্বন্ধে চারুবাবুর[১] সঙ্গে কথা হয়েছে, একটি ভ্যলুম করার বাসনা আমাদের সকলেরই আছে। লেখাগুলি সংগ্রহ করা আছে কি? কতটা জায়গা নেবে সেটা হিসেব করা দরকার।

রবিবার[২] সকালে যাওয়ার কোনও বাধা আছে কি না অনিলবাবুর[৩] কাছে জানতে চেয়েছি। অনুমতি পেলে বেলা ১২টায় পৌঁছব। মাত্র দেড় ঘণ্টা দুঘণ্টার কাজ আছে।

আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি প্রণতঃ সজনীকান্ত

'মনোরমা'[৪] সম্বন্ধে আপনার অভিমত মাঘের 'প্রবাসীতে' ছাপিয়ে দিয়েছি।

১৭

১৮ জানুয়ারি ১৯৪০

২৫/২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা
১৮/১/৪০

শ্রীচরণেষু

ডক্টর হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের[১] সঙ্গে কাল দেখা হয়েছে। তিনি বিশেষ করে আপনাকে জানাতে বললেন, এই ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ পদের জন্যে অমিয়বাবুর[২] একটি দরখাস্ত যেন নিশ্চয়ই ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছয়। তিনি মে মাসে অবসর গ্রহণ করবেন। তখনই লোক নেওয়া হবে। সিরাজ-উদ্দৌলা বিভাগ মিঃ জুহির নামক একজন সগোত্রীয়কে ঢোকাবার চেষ্টায় আছেন। তাঁর ডিগ্রী ইত্যাদি অমিয়বাবুর চাইতে অনেক

খাটো। তিনি নিজে (ডক্টর মুখোপাধ্যায়) নির্ব্বাচন সমিতিতে থাকবেন, শ্যামাপ্রসাদ[৩] বাবু[ও] আছেন। তিনি অমিয়বাবুকেই নির্ব্বাচন করবেন। আপনি যদি শ্যামাপ্রসাদবাবুকে এ বিষয়ে বলেন এবং কাউকে দিয়ে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষকে[৪] ধরাতে পারেন তাহলে তাঁর বিশ্বাস অমিয়বাবুর চাকরি হবে [।] ৩১শে জানুয়ারি দরখাস্ত পেশের শেষ দিন।

অবচেতন মনের আর একটি সচিত্র কবিতা আপনার কাছে পাওনা আছে, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।[৫]

শ্রীযুক্ত বি. আর. সেন[৬] কলকাতায় এসেছিলেন দেখা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের বাংলার লাটবাহাদুর মেদিনীপুরে শুভ পদার্পণ করবেন, সেজন্যে তাঁর নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। তিনিই সুকৌশলে লাট সাহেবকে ঝাড়গ্রাম রাজের[৭] স্কন্ধে চাপাচ্ছেন, সুতরাং তাঁরও অবস্থা সর্ব্বরকমে কাহিল। ও ভূত না নাম্‌লে ওঁদের বোলপুর-যাত্রা নিষ্ফল হবে।

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি প্রণতঃ সজনীকান্ত

১৮
৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

২৫/২ মোহনবাগান রো,
কলিকাতা
৩. ২. ৪০

শ্রীচরণেষু

আপনার সমন পাইলাম।[১] আপনাকে বিপন্ন করিবার বাসনা এতটুকুও নাই। পুলিনকে[২] ঠেকাইবার জন্য যথাসময়ে হাজির হইব।

পুলিন ও অমিয়বাবু[৩] সম্ভবতঃ কাল রবিবার[৪] সন্ধ্যার ট্রেনে পৌঁছিবেন; আমার সকালের ট্রেনে অর্থাৎ বেলা ১২টায় পৌঁছিবার ইচ্ছা; যদি কোনও কারণে ঐ ট্রেনে না যাওয়া হয়, সন্ধ্যায় সকলেই একসঙ্গে পৌঁছিব। সকালে গেলে একটু বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব সেইজন্য সকালের ট্রেন ধরিবার চেষ্টা করিব।

আমার একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ আছে। অমিয়বাবু চাকরীর জন্য দরখাস্ত দিতেছেন, এই সময়ে তাঁহার রচনার একটু পাব্লিশিটি হইলে কাজে লাগিবে। আপনি যদি তাঁহার খসড়া[৫] ও একমুঠো[৬] র উপর কিছু লিখিয়া দেন তাহা হইলে উপকার হইবে।

অন্যান্য কথা সাক্ষাতে বলিব। আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি প্রণতঃ সজনীকান্ত

পুঃ রুগ্ন [রুগ্‌ণ] সুধাকান্তদা'র সহিত টেলিফোনে সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি রঞ্জন রশ্মির কবলে পড়িয়াছেন।

১৯
১২ মার্চ ১৯৪০

২৫/২ মোহনবাগান রো,
কলকাতা
১২/৩/৪০

শ্রীচরণেষু,

আপনার সামান্য পাঁচ ছত্রের পত্র[১] আমাকে পীড়িত করিয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার আশা পূর্ণ করিতে না পারিব ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আর কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না। ম্যানেজার দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের[২] সহিত দেখা করিয়াছিলাম তিনি সম্পূর্ণ আশা দিয়াছেন। কিন্তু আশা পূর্ণ হইতে একটু সময় লাগিবে একথাও বলিয়াছেন। যিনি এইসকল সমৎস্য দীঘির খবরদারিতে ছিলেন তিনিই শেষ মুহূর্তে বেড়াজাল ফেলিয়া বহু কাৎলাকে ঘায়েল করিয়া গেলেন ; খাবি খাইবার সময় নিশ্চয়ই দিতে হইবে।

ফুরসৎ পাইলেই হাজির হইতেছি[৩] ; ঢাকায় দুটি রেডিও-বক্তৃতা এবং রংপুরে ও বাঁকুড়ায় দুটি সভাপতিত্ব খাঁড়ার মতো মাথার উপর ঝুলিতেছে। বাঁকুড়ার যেরূপ পরিচয় পাইলাম তাহাতে নিরুৎসাহ বোধ করিতেছি[৪], কিন্তু এখন আর উপায় নাই।

আমার অবচেতনার প্রার্থনা[৫] এখন চাপা থাকে। মাছিতত্ত্ব[৬] পাইয়াছি এবং পাইয়া খুশী আছি। নিজেই সময়ে অসময়ে এত ভন্‌ভন্‌ করিয়াছি যে উহারই মধ্যে আত্মদর্শন করিয়া লজ্জা অনুভব করিতেছি।

প্রণাম জানিবেন।

ইতি সজনীকান্ত

২০
১৮ মার্চ ১৯৪০

মেদিনীপুর
১৮/৩/৪০

শ্রীচরণেষু,

মেদিনীপুর আসিয়াছি এবং ঝাড়গ্রামের[১] সহিত দেখা করিয়াছি। তাঁহারা আমাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিয়াছেন। এ যুগের মানুষকে এবং বিশেষভাবে জমিদার শ্রেণীর মানুষকে যদি বিশ্বাস করা সম্ভব হয় তাহা হইলে আমরা আপাতত এই প্রতিশ্রুতিতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। তবে কথাবার্ত্তায় যে রূপ বুঝিলাম, উঁহাদের ইচ্ছা, আমরা তাঁহাদের নিকট কোনও একটা "definite proposal" উপস্থিত করি। আমি বোলপুর গিয়া অনিলবাবুর[২] সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে চিঠি লিখিব।

আমি আজই কলিকাতায় ফিরিতেছি, বৃহস্পতিবার[৩] রাত্রে ঢাকা যাইব এবং সোমবার[৪] সকালে সেখান হইতে ফিরিব, আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি প্রঃ সজনীকান্ত

২১
২৮ জুন ১৯৪০

Sanibarer Chithi

Phone : Bz 637
25/2 Mohanbagan Row
Calcutta
২৮/৬/৪০

শ্রীচরণেষু,

আপনার ওষুধ[১] খেয়ে অনেকটা চাঙ্গা হয়েছি— এখন মাথাটা মাঝে মাঝে খালি খালি ঠেকে, লিখতে পড়তে ইচ্ছে যায় না। এই উপসর্গটা দূর করবার জন্যে যদি একটা ওষুধ দেন ভাল হয়। ডিউয়ির[২] বইয়ের দাম ৯৷৷০ টাকা, কেনা সাধ্যের মধ্যে নয়।

কাগজে দেখলাম আপনি শীঘ্র নামছেন[৩]। কবে আসবেন যেন জানতে পারি। আপনার ওষুধের প্রত্যক্ষ ফল দেখলে আপনি খুসী হবেন।

শুনলাম আপনার শরীর আশানুরূপ ভাল যাচ্ছে না, শুনে চিন্তিত আছি।

আমার প্রণাম জানবেন।

ইতি প্রঃ সজনী

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত। পরিচয়

"বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?
অরণ্যভূমি আঁধার করিয়া শতেক বর্ষ ধরি
শাখাপ্রশাখায় মেলি সহস্র বাহু
মৃত্তিকারস করিয়া শোষণ শিকড়ের পাকে পাকে
নিম্নে বিরচি বহুবিস্তৃত স্নেহছায়া আশ্রয়—
অভ্রংলিহ বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?"

উদ্ধৃত অংশটি সজনীকান্ত দাসের "মর্ত্য হইতে বিদায়" কবিতা থেকে গৃহীত। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ সালে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই কবিতাটি রচনা করেন। এবং কবিতাটি, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪১, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শোকসভায় পঠিত হয়।

বড়োই বিস্ময় জাগে যখন মনে পড়ে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'শনিবারের চিঠি'র কয়েকটি সংখ্যার কথা, যেখানে সজনীকান্তের 'শ্রীচরণেষু', 'হেঁয়ালি' ও 'ভ্রান্তি'র মতন কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত প্রসঙ্গ, এত বছর পরেও, আজও বাংলা সাহিত্যে একটি অতি-বিতর্কিত ও আলোচিত সমালোচনার বিষয়।

সজনীকান্ত দাস—জন্ম : বর্ধমানস্থ বেতালবন গ্রামে, মাতুলালয়ে ৯ ভাদ্র ১৩০৭ বঙ্গাব্দে (২৫ অগস্ট, ১৯০১)। পিতা হরেন্দ্রলাল দাস ও মাতা তুঙ্গলতা দেবী।

ব্যঙ্গসুনিপুণ সমালোচক-সম্পাদক হিসেবে সজনীকান্ত বাংলাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। দা'ঠাকুরের ভাষায় তিনি ছিলেন 'নিপাতনে সিদ্ধ'। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে রবীন্দ্রভক্ত।

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত।

রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে সাহিত্য-জীবনের কোনো কাজই সজনীকান্তের সম্পূর্ণ হত না।

কিন্তু সজনীকান্ত একসময় রবীন্দ্র-বিদূষণে শালীনতার সমস্ত সীমারেখা লঙ্ঘন করেছিলেন। সারস্বত জীবনের উত্তরপর্বে রবীন্দ্রনাথ মর্মান্তিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন সজনীকান্তের কাছেই।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ অপরিসীম স্নেহ বশে তাঁর এই 'রাবণ-ভক্ত'টির চিত্ত জয় করেছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে গুরুশিষ্যের সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা অকৃত্রিম আন্তরিকতায় হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল।

গুরুশিষ্যের এই ব্যক্তি-সম্পর্কের উত্থানপতনের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে এই আলোচনা কতকগুলি পর্বে বিন্যাস্ত হয়েছে।

ক. শৈশবে ও কৈশোরে সজনীকান্তের চিন্তায়-মননে রবীন্দ্রনাথ :

সজনীকান্ত তখন বছর নয়-দশের বালক মাত্র, মালদহ জেলা ইস্কুলে পাঠরত, এই সময়ে গ্রীষ্মাবকাশে একদিন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংকলিত একখানি বই তাঁর হস্তগত হয়। গোড়া থেকে বইটি খুব মনোযোগ সহকারে পড়তে পড়তে হঠাৎ একটি কবিতা চোখে পড়ে যায় সজনীকান্তের। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের লেখা—

"দিনের আলো নিবে এল, সূর্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।'

এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত লিখেছেন—'সামান্য একটি কবিতা, ধরন-ধারণ যে খুব অচেনা তা নয়, কথাগুলাও নূতন নয়— কিন্তু মনে কোথা হইতে একটা নূতন রঙ ধরিল, একটা অপরূপ সুরের মূর্ছনা লাগিল।

এ যেন একান্ত আমারই কথা। এমন করিয়া আমার মনের কথা এতদিন পর্যন্ত তো আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই! তলায় নাম

দেখিলাম— শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গুরুমন্ত্রের মত সেই নাম জপমন্ত্র হইল। কবিতাটিও মুখস্থ হইয়া গেল।” (‘আত্মস্মৃতি’, সুবর্ণরেখা সংস্করণ পৃ. ১২-১৩)

সজনীকান্ত বলেছেন, তাঁর জীবনের বাণীসাধনার এখানেই সূত্রপাত।

শৈশবে সজনীকান্ত তাঁর বড়দাদার কাছ থেকে যোগীন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত একখণ্ড ‘সরল কৃত্তিবাস’ * উপহার পেয়েছিলেন। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই সরল কৃত্তিবাসের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার তিনি কবির লেখার সঙ্গে পরিচিত হলেন। এর পরবর্তীকালে সজনীকান্তের হস্তগত হয় ‘কথা ও কাহিনী’, যাকে তিনি অভিহিত করেছেন ‘বাল্যে শ্রেষ্ঠ রত্নসম্ভার’ বলে। বালক সজনীকান্তের কল্পনা-রাজ্য জুড়ে ছিল রামায়ণ ও মহাভারত। এ ছাড়া ছিল যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংকলনগুলি এবং রবীন্দ্রনাথের ‘কথা ও কাহিনী’ এবং ‘শিশু’।

স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে সজনীকান্ত বাঁকুড়া কলেজে ভর্তি হন। সেই সময় রাজনৈতিক কারণে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েও বাঁকুড়ায় নির্বাসিত হলেন। বাঁকুড়া কলেজে, হস্টেল জীবনের কর্মসূচী বলতে সজনীকান্তের ছিল— খাওয়া-দাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, কিছুটা মোড়লি এবং সুর করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করা। পিতা হরেন্দ্রলাল পুত্রের সাহিত্যচর্চাকে একেবারেই প্রশ্রয় দিতে চান নি। অতএব ছাত্রাবস্থায় বই খরিদ করার মতন সংগতি সজনীকান্তের ছিল না। বাধ্য হয়ে সজনীকান্ত এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন। সরকারি কাগজের খাতা বাঁধিয়ে সম্পূর্ণ বই নিজের হাতে নকল

* সরল কৃত্তিবাস অর্থাৎ কৃত্তিবাস-প্রণীত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ’, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

করেছিলেন। শুধু রবীন্দ্রনাথের সতেরোখানি বই তিনি এইভাবে নকল করেছিলেন। এবং সেইসঙ্গে বইগুলি সজনীকান্তের কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"কাব্য-কবিতা তো বটেই 'গোরার'র মতো বিপুলায়তন উপন্যাসেরও বহু অংশ পরিণত বয়স পর্যন্ত তিনি অনায়াসে আবৃত্তি করতে পারতেন।" ('রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ১৩)

১৯২৪ সালে সজনীকান্ত কিছুদিনের জন্যে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সময় তিনি রবীন্দ্রনাথকে সতেরোখানি তাঁর লেখা বই নকলের কথা জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জানতে পেরে বিস্মিত হন এবং বেশ কৌতুক বোধ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছেন—"নকলগুলি তখন পর্যন্ত আমার নিকটে কলিকাতাতেই ছিল, আমি প্রমাণ দাখিল করিলাম। এতখানি তিনিও আশা করেন নাই। তিনি সেগুলি আমার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। অনেককেই সেগুলি দেখাইয়াছেন এবং অনেকের কাছে গল্প করিয়াছেন সে কথা পরে জানিতে পারিয়াছি ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার বহুমূল্য নকলগুলির কি দশা হইয়াছে তাহা আর জানিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত পরবর্তী যাবতীয় পুস্তকের এক এক খণ্ড আমাকে বিনামূল্যে দিবার হুকুম দিয়াছিলেন, ইহাতেই আমার বাল্য-কৈশোরের শ্রম সার্থক হইয়াছিল।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৩০)। বাঁকুড়া কলেজে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থটি বিশেষভাবে সজনীকান্তকে প্রভাবিত করে।

বাঁকুড়া কলেজে আই. এস্‌সি. পাঠ সমাপ্ত করে সজনীকান্ত ১৯২০ সালে কলিকাতাস্থ স্কটিশ চার্চ কলেজে বি.এস্‌সি. ক্লাসে ভর্তি হলেন। প্রথম দিকে তিনি ডাফ্ হস্টেলে ছিলেন, পরবর্তীকালে

স্থানান্তরিত হলেন অগিলভি হস্টেলে।

সজনীকান্ত অগিলভি হস্টেলে থাকাকালীন শিবদাস রায়ের ব্যবস্থাপনায় ভাদ্র, ১৯২১, বোলপুর ভুবনডাঙার মাঠে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, শান্তিনিকেতন আশ্রম দল ও কলিকাতাস্থ অগিলভি হস্টেল দলের মধ্যে। তখন তরুণ সজনীকান্ত গোলরক্ষকের ভূমিকায় 'অগিল্‌ভি হস্টেল' দলভুক্ত ছিলেন। খেলার ফলাফল বর্ণনা করে সজনীকান্ত লিখেছেন—"খেলায় দুই গোলে হারিয়া ফিরিলাম বটে, কিন্তু জীবনের খেলায় সেই প্রথম গুরুদর্শনের দিন হইতেই যে-জিত হইল আজিও তাহার ফলভোগ করিতেছি।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪৯)

সজনীকান্তের কলকাতায় প্রত্যাগমনের অল্পকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ সদলবলে কলকাতায় আসেন— প্রধানত দুটি কারণে— কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে "সত্যের আহ্বান" পাঠ ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রথম 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব পালনে। সজনীকান্ত বর্ষামঙ্গলের অপূর্ব স্বপ্নময় পরিবেশে রবীন্দ্রনাথকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

অনতিবিলম্বে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯২১ (১৯ ভাদ্র ১৩২৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ষষ্টিতম বার্ষিক সংবর্ধনায় যোগ দেবার অবকাশ পেয়েছিলেন সজনীকান্ত। সেই রাত্রেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে বন্দনা করে 'রবীন্দ্রনাথ' নামক একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সজনীকান্তের স্বহস্তাক্ষরে হস্টেল ম্যাগাজিনভুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু এই পারমার্থিক কবিতাটি কবি সমীপে কীভাবে পৌঁছানো যায় এই নিয়ে সজনীকান্তের দুর্ভাবনা হয়। ওই বছরই ৭ই পৌষের উৎসবে সজনীকান্ত একাই শান্তিনিকেতন যান, উদ্দেশ্য তাঁর অর্ঘ্য কবির নিকট নিবেদন করা। দুর্ভাগ্যবশত তাঁকে ফিরে আসতে হয় বিফল

হয়ে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় স্কুলজীবনে 'গোরা' উপন্যাসটি সম্পূর্ণ স্বহস্তে নকল করবার সময় একটি বৈজ্ঞানিক ভুল তাঁর নজরে পড়েছিল, সজনীকান্তের ভাষায়, "মুদ্রাকরপ্রমাদ নয়, রবীন্দ্রনাথ সময়ের হিসাব না রাখিয়াই লিখিয়াছিলেন।" ('আত্মস্মৃতি', সুবর্ণরেখা সংস্করণ পৃ. ৮১)

'গোরা'র ষষ্ঠ অধ্যায়ের একস্থানে ছিল,—"ক্ষণকালের জন্য রমাপতি চাহিয়া দেখিল, গোরার সুদীর্ঘ দেহ একটা দীর্ঘতর ছায়া ফেলিয়া মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া একাকী ফিরিয়া চলিয়াছে।"

'মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে' ছায়া দীর্ঘতর হতে পারে না— এই মর্মে তিনি কবিকে একটি পত্রযোগে সবিনয়ে তাই নিবেদন করেছিলেন সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত কবিতাটিও পাঠিয়েছিলেন। কবির উত্তর আসে ৫ মার্চ ১৯২২।

[দ্র. রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র সংখ্যা ১। সূত্র—১]

খ. 'শনিগ্রহের মঙ্গল গ্রহ'

বি. এস্‌সি. পাঠ শেষ করে সজনীকান্ত প্রথমে গিয়েছিলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষালাভের জন্য। কিন্তু দেড় মাস কাল সেখানে থেকে ভালো না লাগায় কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন এবং সেইসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে, সায়েন্স কলেজে পদার্থবিদ্যায় (তাপ) নিয়ে ভর্তি হলেন। স্নাতকোত্তর বিভাগে শেষ পরীক্ষার অব্যবহিতকাল পূর্বেই তাঁর সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'র যোগানন্দ দাসের পরিচয় হয়— এবং তার পরেই তিনি পাকাপাকি ভাবে বিজ্ঞান সরস্বতীকে বিদায় দিলেন। এখানেই তাঁর কলেজী বিদ্যার সমাপ্তি ঘটে।

১৯২৪ সালের ২৬ জুলাই শনিবার (১০ শ্রাবণ, ১৩৩১) সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

অষ্টম সংখ্যায় সজনীকান্তের 'ভাবকুমার প্রধান' ছদ্মনামে 'আবাহন' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়।

প্রথাগত পড়াশুনো অর্ধ পথে সমাপ্ত করে, সেইসঙ্গে অভিভাবকদেরও আর্থিক দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে, নিয়মিত ভাবে শুরু হল 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডা। এই সময় তাঁর সম্বল ছিল দুটি টিউশনি থেকে আয় মাসিক ৪৫ টাকা। আত্মসম্মানে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তন্মধ্যে একটিতে দিলেন ইস্তফা। ২৫ টাকা আয়, মেসের ঘর-ভাড়া চুকিয়ে দৈনিক ব্যয় অসাধ্য। অতএব ২৭নং বাদুড়বাগান লেনকেত বিদায় জানাতে হল। বাস্তুহারা সজনীকান্তকে এবার উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছিলেন কবি জীবনময় রায়। তিনিই সজনীকান্তকে নিয়ে গেলেন ১০নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে, সেখানে বিশ্বভারতীর সদ্যস্থাপিত কার্যালয় ও গ্রন্থালয়। সেখানকার চারতলার একটি অব্যবহৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সজনীকান্তের আশ্রয় হয়।

বিশ্বভারতী কার্যালয়ের তৎকালীন কর্মসচিব কিশোরীমোহন সাঁতরা অসুস্থ থাকায়, বিশ্বভারতীর স্থানীয় কর্ণধার ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তাঁর অনুমতি ছাড়া সেখানে বসবাস সম্ভব নয়। কাজেই পরের দিনই জীবনময় রায় সজনীকান্তকে নিয়ে গেলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের কাছে। এবং রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রুফ দেখার বিনিময়ে সেখানে থাকার অনুমতি পেলেন সজনীকান্ত। এখানে তাঁর প্রথম গ্রন্থসম্পাদনার কাজে হাতে-খড়ি হয়। ১২৯২ বঙ্গাব্দের 'বালক' থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পাঠ মিলিয়ে বিশ্বভারতী-সংস্করণ 'রাজর্ষি (জানুয়ারি ১৯২৫) প্রকাশের কাজে জীবনময় রায়ের সহযোগিতায় তিনি নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন।

ইত্যবসরে একাদশ সংখ্যা শারদীয় 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয় 'কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ'। যার শেষ কবিতা 'অসমছন্দ' তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। বিদ্রোহী কবিতা 'ব্যাঙ' প্রকাশিত হল।

একদিন গভীর রাতে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ডেকে পাঠালেন সজনীকান্তকে— প্রশ্ন করেছিলেন : 'কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ' তোমার লেখা? সদর্থক উত্তর পেয়ে লেখার প্রশংসা করে বলেছিলেন, কিন্তু এসব বাজে কাজে সময় নষ্ট না করে বিশ্বভারতীর সেবায় পুরোপুরি লেগে গেলে কতকটা স্থায়ী কাজ হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন— "সজনীকান্ত বিশ্বভারতীর সেবার চেয়ে শনিবারের চিঠির পরিচর্যাকেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করলেন, সুতরাং বিশ্বভারতীর আশ্রয় ত্যাগ করতে হল।" ('রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ২২)।

এবার তাঁর সহায় ও সঙ্গী হলেন যোগানন্দ দাস। অষ্টম সংখ্যা থেকেই সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'র লেখক। কিন্তু সাতাশ সংখ্যা প্রকাশিত হবার পরে সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' ৯ ফাল্গুন ১৩৩১ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হল। 'চিঠি'র পঞ্চত্বপ্রাপ্তি সজনীকান্তের পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিল। এবং তাঁর এই আর্থিক সংকটের সময় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে, সজনীকান্তের জীবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল।

১৩৩১ অগ্রহায়ণ থেকে 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের পশ্চিম-যাত্রার কাহিনী প্রকাশিত হয়। কিন্তু মাঘ ১৩৩১ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে তা বন্ধ হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ৫ ফাল্গুন ১৩৩১ (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫) দক্ষিণ আমেরিকা সফর সেরে দেশে ফিরেছিলেন। কবির দেশে প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসীর সম্পাদকীয় তাগাদা শুরু হয়। এই সময় কবি

বলেছিলেন 'লেখা বীজাকারে তাঁর নোট বইতে আছে'... উপযুক্ত লেখক পেলে তিনি মুখে মুখে বলে তার সম্পূর্ণ রূপ দিতে সক্ষম। প্রবাসীর কর্তৃপক্ষ সজনীকান্তকে অনুলেখকের কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন। এই নিয়োগ ব্যবস্থার পশ্চাতে কিছু কারণ নিশ্চয় ছিল— প্রথমত সজনীকান্ত ১৯২১ থেকে কয়েকবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন, দ্বিতীয় কারণ, সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর সভ্য হিসেবে নাম লিখিয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ মহলে যথেষ্ট পরিচিত হয়েছিলেন। তৃতীয় কারণ সজনীকান্ত বেশ কয়েকবার রবীন্দ্রনাথের ভাষণের অনুলেখনের কাজটি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন।

অনুলেখন দক্ষতার গুণেই সজনীকান্ত কবির কাছ থেকে শুনে শুনে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' লেখার গৌরব লাভ করেছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ প্রশান্ত মহলানবিশের অতিথি হয়ে, কলিকাতাস্থ আলিপুরের আবহাওয়া-দপ্তরের অধিবাসী। সজনীকান্তকেও এই কাজের জন্যে ওখানেই থাকতে হয়েছিল।

'যাত্রী' গ্রন্থের ১৩৫৩ কার্তিক সংস্করণে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' ১৬৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। সজনীকান্তের অনুলেখনের অংশ প্রায় অর্ধেক পৃ. ৯১-১৬৯। 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' দুভাগে বিভক্ত— পূর্বার্ধের সময়-সীমা— ২৪ অক্টোবর ১৯২৪ থেকে ৭ অক্টোবর ১৯২৪। উত্তরার্ধ শুরু হয় তার চারমাস পর, সময়সীমা হল ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫। সম্পূর্ণ উত্তরার্ধের অংশটুকু সজনীকান্তের অনুলিখন।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে সজনীকান্তের সমস্ত সংকটের মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথই তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। এই সম্বন্ধে সজনীকান্ত লিখেছেন —"শনি গ্রহের তিনি মঙ্গল গ্রহ।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৩১)

১৩৩২ বঙ্গাব্দের বৈশাখে সজনীকান্ত শান্তাদেবীকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন— রবীন্দ্রনাথের পঞ্চষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে। ফিরে এসে একদিন কলিকাতাস্থ বিশ্বভারতী কার্যালয়ে গিয়ে জানতে পারলেন, রবীন্দ্রনাথের নতুন কাব্য-গ্রন্থ 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হচ্ছে। 'পূরবী' তিন ভাগে বিভক্ত—'পূরবী' অংশে হালী পুরাতন কবিতা, 'পথিক' অংশে নূতন ডায়রির কবিতা এবং 'সঞ্চিতা' অংশে হারাইয়া যাওয়া পুরাতন কবিতা। এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন— "আধুনিক পুরাতন খুঁজিতে খুঁজিতে অতি পুরাতন অনেকগুলি কবিতাও আবিষ্কৃত হইল— অনেকগুলি স্বদেশী আমলের বিখ্যাত কবিতা যাহা এতাবৎকাল পরিত্যক্ত হইয়া আসিয়াছে। আমার খাতায় নকল ছিল, আমিই সেগুলি সরবরাহ করিলাম।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৪৩)

গ. "শনিবারের চিঠি, আধুনিক সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ"

১৩৩০ বঙ্গাব্দে 'কল্লোল'-এর প্রথম প্রকাশ। আধুনিক সাহিত্যের যে প্রবল জোয়ার দেখা দিয়েছিল—তারই কলধ্বনি শুরু হয় কল্লোলে। যদিও কল্লোল গোষ্ঠী বলতে বুঝতে হবে 'কালিকলম' 'ধূপছায়া', 'প্রগতি', 'উত্তরা' এবং কিছু পরবর্তীকালের 'পূর্বাশা'র লেখক গোষ্ঠীকেও। এঁরা ছিলেন এক নতুন ভাবধারায় যৌবনোচিত উদ্দামে উচ্ছ্বসিত মুক্তপ্রাণের সাহিত্য-রচনার স্রষ্টা। 'কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির' অনিবার্য পরিপূরক হল 'শনিবারের চিঠি'।

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১০ শ্রাবণ (১৯২৪, ২৬ জুলাই) সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক যোগানন্দ দাস ও কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য-সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়ে 'শনিবারের চিঠি'র জন্ম।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র বেশ কয়েকটি সংখ্যায় বিদ্রোহী কবি নজরুলের কবিতাকে ব্যঙ্গ করে কিছু রচনা প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল' ও 'কালিকলম'-এর সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'র সংঘাতের সূত্রপাত হয় নজরুলকে কেন্দ্র করে।

সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' সাতাশ সংখ্যায় (৯ ফাল্গুন ১৩৩১) পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়।

পরবর্তী পর্যায় 'শনিবারের চিঠি' মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়। অনিয়মিত কিছু সংখ্যা। প্রকাশের পর ১৩৩২-এর কার্তিক সংখ্যাতেই এই পর্যায় শেষ হয়।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'শনিবারের চিঠি'র তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। জ্যৈষ্ঠে 'জুবিলি সংখ্যা', আষাঢ়ে 'বিরহ সংখ্যা' ও কার্তিকে 'ভোট সংখ্যা'। সমকালীন সাহিত্যকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয় 'বিরহ সংখ্যা'। এই সংখ্যাতে সজনীকান্ত লিখলেন 'Orion বা কালপুরুষ ও অশোক চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন একটি নাটক 'স্বর্গে Sensation ও একটি কবিতা 'বিরহ-বেদনা-বিশ্লেষণ'। 'শনিবারের চিঠি'তে পরবর্তীকালে অত্যাধুনিক সাহিত্য নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের যে ঝড় উঠেছিল তার প্রথম কলধ্বনি যেন শোনা যায় ওই তিনটি রচনাতে।

'শনিবারের চিঠি' 'বিরহ সংখ্যা' প্রকাশের পাঁচ মাস পরে, পৌষ মাসে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হল প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন। সেখানে অমল হোম "অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন। প্রবন্ধটি মাঘ মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ পাঠে অমল হোম একেবারে মধুচক্রের মধ্যবিন্দুতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করলেন।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিকতার জোয়ার এসেছিল তার পূর্বরঙ্গ রচিত হয় ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠে 'কল্লোল'-এ, বুদ্ধদেব

বসুর 'রজনী হল উতলা' গল্পে। পরের মাসে অর্থাৎ ১৩৩৩ আষাঢ়ের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-এর রচনা 'গাব আজ আনন্দের গান'। শ্রাবণের 'কল্লোল'এ যুবনাশ্ব (মণীশ ঘটক) লিখলেন 'পটলডাঙার পাঁচালি', ফাল্গুনের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হল বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' এবং ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ-এর 'কালিকলম'-এ নজরুলের 'মাধবীপ্রলাপ'। 'শনিবারের চিঠি'র বক্তব্যকে বহু রচনার মাধ্যমে স্পষ্টতর করেছেন 'সত্যসুন্দর দাস' ছদ্মনামে মোহিতলাল মজুমদার। সজনীকান্ত 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছেন তাঁদের অভিযোগ অশ্লীলতার বিরুদ্ধে ছিল না; তাঁদের অভিযোগ ছিল বিকৃত যৌনবোধের বিরুদ্ধে সজনীকান্ত ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে ২৩ ফাল্গুন সাময়িক সাহিত্যের বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন।

২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩ রবীন্দ্রনাথ উত্তরে লেখেন "আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না।... সুসময় যদি আসে আমার যা বলবার বলব।"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন— "এই সময়ে 'কবির মন ঋতুরঙ্গশালা'র মধ্যে ডুবিয়া আছে; তাই বোধহয় বিতর্কমূলক রচনায় মন গেল না।" ('রবীন্দ্রজীবনী' ৩, পৃ. ৩০৭)

রবীন্দ্রনাথের এই পত্রের ভাষ্য পাঠ করে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোলযুগ'-এ লিখেছেন ""রসিকতাটা বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।" হয়তো তাই! রসিকতার মর্ম বুঝে রবীন্দ্রনাথ অমল হোম ও সজনীকান্তকে সমর্থন করেই লিখলেন 'সাহিত্য-ধর্ম্ম' প্রবন্ধটি। প্রচণ্ড বিতর্ক সৃষ্টিকারী এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বিচিত্রা'য় শ্রাবণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে।

এই বিতর্কের প্রতিবাদ করে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় পরবর্তী সংখ্যার বিচিত্রায়। ১৩৩৪ ভাদ্র 'বিচিত্রা'য়

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখলেন 'সাহিত্যধর্ম্মের সীমানা', ১৩৩৪ আশ্বিন 'বিচিত্রা'য় তার জবাবে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী লিখেছেন— "সাহিত্যধর্ম্মের সীমানা বিচার"। তার পাল্টা জবাব দিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা বিচারের উত্তর'। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে লেখেন 'সাহিত্যের রীতিনীতি' প্রবন্ধটি— প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ আশ্বিনের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায়।

আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমস্তটা 'সাহিত্য-ধর্ম্ম' প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় নি। আধুনিক সাহিত্য-সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্য রচিত হয় 'সাহিত্যে নবত্ব'। 'যাত্রীর ডায়ারি' শিরোনামায় ১৩৩৪ অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ 'বিচিত্রা'য় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখলেন 'কৈফিয়ৎ বা সাহিত্য-ধর্ম্মর সীমানা বিচারের উত্তর'।

এদিকে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ৯ ভাদ্র নবপর্যায়ে মাসিক 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক যোগানন্দ দাস ও সহকারী সম্পাদক সজনীকান্ত। এই পর্যায়েই আধুনিক সাহিত্যের প্রতি 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণ হয় তীব্র।

রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ১৩৩৪, ২৩ পৌষ তারিখে লেখা এক পত্রে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। পত্রখানি ১৩৩৪ মাঘের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়। তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল—

"শনিবারের চিঠিতে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি। বোঝা যায় যে এই ক্ষমতাটা, আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেচে।"

"ব্যঙ্গরসকে চিরসাহিত্যের কোঠায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আর্টের দাবী আছে। 'শনিবারের চিঠি'র অনেক লেখকের কলম

সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান— নব-নব হাস্যরসের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তি বিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়।...” (‘আত্মস্মৃতি’, পৃ. ১৯২-৯৩)

এই সময় ‘শনিবারের চিঠি’র সম্পাদক ছিলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী, কর্মাধ্যক্ষ সজনীকান্ত।

এই চিঠিটি ‘শনিবারের চিঠি’তে প্রকাশিত হবার ফলে বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত -সম্পাদিত ‘প্রগতি’ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের মাঘে প্রকাশিত হল একটি মন্তব্য। তার কিয়দংশ হল— “হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ ‘শনিবারের চিঠি’তে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঐ পত্রিকায় তাঁহার এই চিঠিখানি কোনোদিন ছাপা হইবে এমন বিশ্বাস তাঁহার নিশ্চয় ছিল তাই তাঁহার ভাষা ঐ পত্রিকার সঙ্গতি রক্ষা করিতে গিয়া তদনুযায়ী অসংলগ্ন ও অসংযত হইয়া উঠিয়াছে। সব চেয়ে মজার কথা এই যে রবীন্দ্রনাথ ‘শনিবারের চিঠি’র কুৎসিত ও জঘন্য ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে ‘আর্ট’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন! তাঁহার জীবনের সায়াহ্নে তাঁহার নিকট হইতে আর্টের এহেন নবতন সংজ্ঞা পাইয়া আমরা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি।”

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনের ‘কালিকলম’-এ বিরূপাক্ষ শর্মার ‘আর্টের আটচালা’ শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশিত হয়। রচনাটি থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত হল— “কবিগুরু ‘শনিবারের চিঠি’কে কোল দিয়েছেন। চৈতন্যদেব জগাই মাধাইকে কোল দেওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত পতিতোদ্ধারের এমন প্রাণমাতান উদাহরণ আর বোধ করি পাওয়া যায় নি।”

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— “কয়েক মাস পরে রবীন্দ্রনাথকে ‘শনিবারের চিঠি’র ও ‘কল্লোল-কালিকলম’-

এর দুই দলের মধ্যে বুঝাপড়ার চেষ্টায় প্রবৃত্ত করাইলেন কয়েকজন অ-সাহিত্যিক— যাঁহাদের সহিত কোনো সাহিত্যগোষ্ঠীর সম্বন্ধ বা সাহিত্যসৃষ্টি বিষয়ে যাঁহাদের কোনো অবদান ছিল না। এই মধ্যস্থতায় প্রধান অংশগ্রহণ করিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের দুই জন অধ্যাপক — প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও অপূর্বকুমার চন্দ।" (রবীন্দ্রজীবনী ৩, পৃ. ৩০৯)

জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা ভবনে' বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্যোগে আধুনিক-সাহিত্য-সম্পর্কে আলোচনা সভা আহ্বান করা হয়। ৪ চৈত্র ১৩৩৪ ও ৭ চৈত্র ১৩৩৪— এই দুই দিন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম দিনের সভায় 'কল্লোল'-এর দল উপস্থিত ছিলেন ও 'শনিবারের চিঠি'র দল অনুপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিনের বিবরণী ৬ চৈত্রের 'বাংলার কথা' নামক দৈনিকে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন— এই বিবরণী কল্লোল-গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কারও লেখা হওয়াই সম্ভব। এই বিবরণী পড়ে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ৭ চৈত্র তিনি আবার সভা-আহ্বান করলেন। সেদিন সভার প্রারম্ভেই তিনি বললেন, "আমরা গেল বারে যে আলোচনা করেছি তার একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে। সে রিপোর্ট যথাযথ হয় নি।" (সাহিত্য-সমালোচনা, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫)। তাই কবি দুই দিনের বক্তব্য স্বয়ং লিপিবদ্ধ করে রাখেন। প্রথম দিনের বক্তব্য বৈশাখের (১৩৩৫) 'প্রবাসী'তে "সাহিত্যরূপ" শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। এই সাহিত্য আলোচনার দ্বিতীয় দিনে দুই পক্ষই তাঁদের পাণ্ডাদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও উপস্থিতির তালিকায় ছিলেন—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অপূর্বকুমার চন্দ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, অমল হোম, নীরদ চৌধুরী, সজনীকান্ত ও প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অধ্যাপক ও সাহিত্য রসিক।

দ্বিতীয় দিনের বক্তব্য ও বিবরণী ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ 'প্রবাসী'তে 'সাহিত্যসমালোচনা' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর ত্রয়োবিংশ খণ্ডে ৪৯২-৫১২ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ দুটি 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

দ্বিতীয় দিনে আলোচনা-সভা উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে বেশ গুরুগম্ভীর হয়ে উঠেছিল। এই দিনে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য শেষ হবার পর নানা জনে নানান প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং কবি সকল প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে কোনো এক ব্যক্তি 'শনিবারের চিঠি'র সমালোচনারীতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে ইতিবাচক প্রশ্ন করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তরে 'শনিবারের চিঠি'র সমালোচনা সম্পর্কে বলেছিলেন— " 'শনিবারের চিঠি'র লেখকদের সুতীক্ষ্ণ লেখনী, তাঁদের রচনা-নৈপুণ্যের আমি প্রশংসা করি, কিন্তু এই কারণেই তাঁদের দায়িত্বও অত্যন্ত বেশি ;"।

ঘ. "রবীন্দ্র-বিদূষণে—শনিবারের চিঠি ও সজনীকান্ত"

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় -সম্পাদিত ১৩৩৪ আষাঢ় মাসিক 'বিচিত্রা' ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যায় (পৃ. ৯-৭০), রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' গীতিনাট্য কাব্য প্রকাশিত হয়। এই নটরাজ গীতিনাট্যকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র-রসিক সমাজে প্রভূত আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু সজনীকান্তের মতে— "ইহাতে সন্নিবিষ্ট বিচিত্র সুরের সুমধুর সঙ্গীতগুলি গান হইয়া কানের ভিতর দিয়া আমার মর্মে তখনও প্রবেশ করে নাই। 'বিচিত্রা'র পৃষ্ঠায় নিতান্ত কবিতারূপে সেগুলিকে পড়িয়াছিলাম ; ভালো লাগে নাই শ্রুতিমধুরও ঠেকে নাই। মনে হইয়াছিল, ভাবের দিক দিয়া তাহা পুরাতন রবীন্দ্রনাথেরই অনুকরণ

এবং অক্ষম অনুকরণ, ছন্দ ও মিল শিথিল।... প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম যে 'নটরাজ' রবীন্দ্রপ্রতিভার আরোহণ নয়, অবতরণ।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৪২)

এই মনের ভাবকে কেন্দ্র করে সজনীকান্ত একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। '২৪/১ ঘোষ লেনের বাসায়' ও 'বিপিনবাবুর চায়ের দোকানের' বন্ধুমহলে বহুবার উদ্দীপনার সঙ্গে প্রবন্ধটি পঠিত হয়। কিছুদিন পরে রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম সমঝদার ডক্টর শচীন্দ্রনাথ সেন এসে সজনীকান্তকে বললেন— "তুই যখন ছাপবি না, ওটা আমার 'অরসিক রায়' বেনামে 'আত্মশক্তি'তে ছাপিয়ে দেব।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৪২)। লেখকসুলভ মোহে সেদিন সজনীকান্ত 'না' বলতে পারেন নি। যথাসময়ে ভাদ্র মাসের ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০ এবং আশ্বিনের ২৭ তারিখে পাঁচটি কিস্তিতে তারানাথ রায়-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'তে প্রবন্ধটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু এই প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যাপারে সজনীকান্ত এতই নিরুৎসাহ ছিলেন যে তিনি প্রবন্ধের "কপি" পর্যন্ত সংগ্রহ করেন নি। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য লক্ষণীয় : "চিন্তালেশহীন অবোধ বালক ঢিলটি নিক্ষেপ করিয়াই খুশি ছিল, আম পড়িল কি পাখি মরিল— সে সম্বন্ধে ভাবিয়াও দেখে নাই। সে চকিত হইয়া উঠিল তখনই, যখন ঢিলটি ফিরিয়া তাহারই গায়ে আসিয়া লাগিল।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ২১৬)

যথাকালে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ ও প্রবন্ধকারের সম্বন্ধে জানতে পারেন। গুরুশিষ্যের সংঘাতের 'ইহাই' সূত্রপাত।

পরবর্তী জীবনে এই প্রসঙ্গে সজনীকান্তের স্বীকারোক্তি লক্ষণীয় : "নিজের অবিমৃষ্যকারিতা এবং বিপক্ষীয় দলের সমর্থকদের ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে আমাদের দলের একমাত্র ভরসা এবং আদর্শ স্বয়ং জনার্দনই সাময়িকভাবে 'শনিবারের চিঠি'কে নয়, একমাত্র আমাকেই ত্যাগ করিয়াছিলেন।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ২১৫)

এমতাবস্থায় স্বয়ং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সজনীকান্তকে দুই দিন বিশ্বভারতী আপিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন যে সজনীকান্ত কাজটি ভালো করেন নি। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সজনীকান্ত প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে বলেছেন "আমার [সজনীকান্ত] গহন মনে কি কি গূঢ় উদ্দেশ্য গোপন ছিল বৈজ্ঞানিক প্রশান্তচন্দ্র তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম, নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলাম আমার [সজনীকান্ত] অসাবধানে ফেলা জল অনেক নীচ পর্যন্ত গড়াইয়াছে। আমি সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া সরাসরি রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হওয়াই সমীচীন সাব্যস্ত করিলাম। সোজাসুজি সামনে যাইবার সাহস হইল না, একখানি দীর্ঘ পত্রযোগে আমার বক্তব্য নিবেদন করিলাম।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ২১৬-১৭)

সজনীকান্ত তখন প্রবাসীর কর্মচারী। ১৩ ডিসেম্বর, ১৯২৭, বেলা তিনটে নাগাদ 'প্রবাসী' আপিসের পিওন-বুক ভুক্ত করে তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে একটি সুদীর্ঘ পত্র রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন।

কবি তখন রবীন্দ্র-পরিষদের সংবর্ধনা গ্রহণের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের অভিমুখে যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। সজনীকান্তের সুদীর্ঘ পত্রটি এইসময় তাঁর হস্তগত হয়। চিঠিটি পড়ে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এবং বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করেই তৎক্ষণাৎ ডাকযোগে তাঁর উত্তরটি লিখে পাঠান।

সাধু চলিত ভাষার সংমিশ্রণ যা রবীন্দ্রনাথের সামান্য চিঠিপত্রেও বিরল। কিন্তু সেই দিন তিনি এত বেশি ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়েছিলেন যে এই 'গুরু-চণ্ডালী দোষ' তাঁকেও স্পর্শ করেছিল। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৫)।

এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯২৮-এর প্রথমার্ধে 'কলিকাতা মহাকরণিকে' বাংলা অনুবাদক পদের জন্য প্রার্থী আহ্বান করে সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

সজনীকান্ত তখন 'প্রবাসী' আপিসে স্বল্প মাইনের চাকুরিরত। আত্মীয়-স্বজনের উদ্যোগে সজনীকান্তও উক্তপদের জন্য দরখাস্ত করতে উদ্যত হন। কিন্তু ওই পদের জন্য দরখাস্তের সঙ্গে প্রশংসাপত্র আবশ্যক। সজনীকান্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে নিবেদন করা মাত্রই তাঁরা সুদীর্ঘ পরিচয়-পত্র দিয়েছিলেন। এতৎসহ, পরিজনবর্গের পরামর্শ রবীন্দ্রনাথের 'কলম' হইতে সামান্য কিছু অবশ্যম্ভাবী। (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৪৬)

অতএব, 'নটরাজ' পর্বের পরেও লজ্জার মাথা খেয়ে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি পথযোগে প্রশংসাপত্র প্রার্থনা করলেন। পত্রে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮-এর মধ্যে প্রশংসাপত্র সজনীকান্তের হস্তগত হওয়া চাই এই তথ্যও তিনি কবিকে জানিয়েছিলেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ নিষ্পত্র চারছত্রের ইংরেজী রচনায় রবীন্দ্রনাথের সহিসংবলিত একটি শংসাপত্র ১৩/২/১৯২৮ তারিখে লিখিত, সজনীকান্তের হস্তগত হয়। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৬)

কবির সহৃদয়তায় ও বদান্যতায় সজনীকান্ত 'মরমে মরিয়া' গেলেন। এবং স্থির করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের শংসাপত্রের অপমান ঘটতে দেবেন না। সুতরাং সেই শংসাপত্র অদ্যাবধি অপ্রেরিতই রইল।

নটরাজ পর্বের রেশ মিটতে-না-মিটতেই 'শনিবারের চিঠি'র দৃষ্টি পড়েছিল প্রমথ চৌধুরীর ওপর।

প্রমথ-বিদূষণের গোড়াপত্তন হল ১৩৩৫ সালের বৈশাখের 'শনিবারের চিঠি'তে। তৎকালীন সম্পাদক নীরদচন্দ্র চৌধুরী বেনামীতে লিখলেন—"শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী— পেন্সিল ড্রয়িং",— "তাঁহার

কালি-কলমের পেশা'র পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে"। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনকার বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে তুমুল আন্দোলনের ও তীব্র প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল।

১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়, 'শনিবারের চিঠি'র তৎকালীন মুদ্রাকর ও প্রকাশক সজনীকান্ত দাস লিখলেন "বাংলা কাব্য-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের দান"। এই প্রবন্ধে 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর যাবতীয় দুর্বলতা বিশ্লেষণ ও "প্যারডি" করে দেখালেন সজনীকান্ত। এই প্রসঙ্গে সজনীকান্তের বিশ্বাস, যদিও "লেখাটিতে যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্য ও ইয়ার্কির অসম্মান ছিল", তথাপি "কাব্যহিসাবে 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর অসার্থকতা কথঞ্চিৎ প্রকট করিতে পারিয়াছিলাম"। প্রমথ চৌধুরী আদর্শে প্যারডি-পারংগম প্রবন্ধকারের দুইটি সনেট 'বালিগঞ্জ' ও 'বেগুন' ওই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল ও যার আঘাত আরো মর্মান্তিক হয়েছিল। ওই সংখ্যাতেই নীরদ চৌধুরী আরো মারাত্মক অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন— "শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী— জের"।

কিন্তু জ্যৈষ্ঠেই এর সমাপ্তি হয় নি—এর জের চলেছিল আষাঢ় সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'তেও। ওই সংখ্যাতে প্রমথবাবুর সংস্কৃত জ্ঞানের ওপর কটাক্ষ করে সজনীকান্ত একটি প্রবন্ধ লিখলেন, ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষের সাহায্যে— "পণ্ডিত প্রমথ চৌধুরী"— পূর্ব খণ্ড ও উত্তর খণ্ড। এই সম্বন্ধে সজনীকান্ত তাঁর আত্মস্মৃতিতে বলেছেন—'হালকা ইয়ার্কি এবারে গভীর অসম্ভ্রম হইয়া উঠিল। ফলে আমরা আমাদের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক বহু বিদগ্ধজনের বিরাগভাজন হইলাম। রবীন্দ্রনাথ "নটরাজ" ব্যাপারে ক্ষুণ্ণ ছিলেন। "প্রথম চৌধুরী" ব্যাপারে তাঁহার ক্ষুব্ধতা ক্রোধে পরিণত হইল।' ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৫৮)

'শনিবারের চিঠি'র প্রমথ-বিদূষণ রবীন্দ্রনাথকে অতিমাত্রায় বিচলিত করে। যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেতে শনিগোষ্ঠীর বিশেষ বিলম্ব হয় নি।

'শনিবারের চিঠি'র সে 'সম্মানের উপহার' অর্থাৎ 'কমপ্লিমেন্টারি কপি' পরবর্তী সংখ্যাটি তিনি স্বহস্তে "রিফিউজড্"—'অগ্রাহ্য' লিখে ফেরত পাঠালেন। প্রধানতম পৃষ্ঠপোষকের এই বিমুখতায় তৎকালীন 'চিঠি'-র গোষ্ঠী বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা শঙ্কিত হন নি। উপরন্তু তাঁরা আরো নির্ম্মমভাবে প্রমথ-বিদূষণে ব্রতী হয়েছিলেন।

১৩৩৪, ১৩ ফাল্গুন (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮), কলিকাতা সিটি কলেজ-সংলগ্ন রামমোহন ছাত্রাবাসে সরস্বতী-প্রতিমা স্থাপন করে পুজোর দাবিতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের সংঘর্ষজনিত গোলযোগের সূত্রপাত হয়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজও জড়িয়ে পড়েছিল। ক্ষিপ্ত ছাত্র সমাজকে শান্ত করবার জন্য 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'-এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই সময়ে 'মডার্ন রিভিউ'এ রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র ও ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে —"সিটি-কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী-পূজা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এই সময়ে 'শনিবারের চিঠি' রবীন্দ্রনাথের মতকে সমর্থন জানালেন। ১৩৩৫ আষাঢ়ের 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্তের— "হিন্দু রিলিজিয়ন ইনসাল্টেড—(স্বপ্নদর্শন)", অশোক চট্টোপাধ্যায়ের —"এই কি হিন্দু-জাগরণ" এবং যোগানন্দ দাসের—'নায়মাত্মা চৌর্যেন বা লভ্যতে" প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৩৫ শ্রাবণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিল সজনীকান্তের "ধর্ম্মরক্ষা"-শীর্ষক সচিত্র ব্যঙ্গ কবিতা। কবিতাটি মূলত রচিত হয়েছিল, 'সিটি কলেজে'কে কেন্দ্র করে অ্যালবার্ট হলে যে বিরাট সভা আয়োজিত হয়— তাকে ব্যঙ্গ করে।

শনিগোষ্ঠীর গহন মনে আশা ছিল সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত এই-সকল রচনা প্রকাশের মাধ্যমে প্রমথ-দূষণে-ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ কিছুটা শান্ত

হবেন। কিন্তু তাঁদের এই আশায় বাধা হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের খাস কলমচী অমিয় চক্রবর্তী। তাঁর রচিত "সাহিত্য ব্যবসায়" প্রকাশিত হল ১৩৩৫ শ্রাবণের 'বিচিত্রা'-য়। বলাবাহুল্য রচনাটি শনিগোষ্ঠীকে খোঁচা দিয়েই রচিত হয়েছিল। সজনীকান্তের ভাষায় "রবীন্দ্রনাথের কলমচীর খোঁচা খাইয়া আমাদের উত্তপ্ত মগজ উত্তপ্ততর হইয়া উঠিল;"। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৬৪)

ইতিমধ্যে 'সাহিত্য-ব্যবসায়' প্রবন্ধের রচয়িতা যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ —এই জনরব রবীন্দ্রনাথের নিকট পৌঁছল। ১৩৩৫ শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি'তে, "অশোক চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্য-ব্যবসায়' প্রবন্ধে দশ দফায় অমিয় চক্রবর্তীকে একরূপ 'নিকেশ' করে সর্বশেষে" লিখলেন—

"ভবিষ্যতে অমিয় বাবু কিছু লিখিলে, আমাদের অনুরোধ যেন তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষা অলঙ্কার ও ভাবের বৃথা অনুকরণের চেষ্টা না করেন।..." ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৬৪)

ওই সংখ্যাতেই মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন "অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী বনাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ।

১৯২৯-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ জুলাই, (১৩৩৫ ফাল্গুন-১৩৩৬ আষাঢ়), চার মাস আটদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বিদেশ যাত্রা করেন। এবার তিনি কানাডা ও জাপান পরিভ্রমণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অল্পদিনের মধ্যে ১৩৩৬ আষাঢ়ের 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত লিখলেন 'শ্রীচরণেষু' শীর্ষক একটি পত্রকবিতা। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে তাঁর এই অর্ঘ্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির চরণ স্পর্শ করে নি। উপরন্তু এইবার 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি চরম আঘাতটি এল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই।

'শনিবারের চিঠি', 'প্রবাসী' প্রেসেই ছাপা হত। এই সময়ে হঠাৎ 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সজনীকান্তকে ডেকে পাঠালেন। ২২ আষাঢ়, ১৩৩৬ (৬ জুলাই, ১৯২৯) সজনীকান্ত 'প্রবাসী'-সম্পাদকের গৃহে উপস্থিত হলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিনা বাক্যব্যয়ে একটি পত্র সজনীকান্তের হাতে দিলেন— রবীন্দ্রনাথের লেখা। পত্রে রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'-সম্পাদককে জানিয়েছেন— শনিবারের চিঠি 'প্রবাসী' প্রেসে ছাপা হলে তিনি আর কোনো ভাবেই 'প্রবাসী'র সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবেন না।

এই নিদারুণ কঠিন পত্রাঘাতে সজনীকান্ত এমনই অভিভূত হলেন যে বিশেষ কিছু না বলেই তিনি সম্পাদক মহাশয়কে বলেছিলেন "বেশ তাহাই হইবে 'শনিবারের চিঠি' অন্যত্র ছাপিব।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ২১৩)

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সজনীকান্ত যে কী ভীষণ আত্মবিস্মৃত ও বিচলিত হয়েছিলেন তারই চিহ্নস্বরূপ শ্রাবণে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিল 'হেঁয়ালি' কবিতা। পরবর্তী জীবনে সজনীকান্তের স্বীকারোক্তি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন "এমন বর্বর কবিতা আমিও খুব বেশী লিখি নাই।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ২৯৩)

এই ভীষণ আঘাত রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করল। 'নটরাজ'-এর সমালোচনার গ্লানি মনে সঞ্চিতই ছিল, এই কবিতা প্রকাশের পর তা দ্বিগুণ হল। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মধ্যবর্তী সেতু। একদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম ভক্তি, অপরদিকে শনিগোষ্ঠীকে তিনি অতিমাত্রায় স্নেহ করতেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন 'শনিবারের চিঠি'র হয়ে দরবার করতে। ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিও বিরূপ হলেন। ১১ পৌষ ১৩৩৬, রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে এই প্রসঙ্গে একটি পত্র লেখেন।

কিন্তু এই সময় কবি এত বেশিরকম বিচলিত ছিলেন যে চিঠিটির একটি নকল সজনীকান্তকে পাঠিয়েছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ৮)

সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে পরবর্তীকালে লিখেছেন যে "রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ক্ষমা না করিলে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ২৯৪)

এই সময় 'শনিবারের চিঠি'র মুমূর্ষু দশা। ১৩৩৬-এর কার্তিক সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশিত হয় ফাল্গুন মাসে। ওই সংখ্যায় সজনীকান্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির উত্তরে একটি সুদীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। কবিতাটির নাম 'ভ্রান্তি'।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন—"শ্রীচরণেষু" "হেঁয়ালি" ও "ভ্রান্তি"—১৩৩৬-এর আষাঢ়, শ্রাবণ ও কার্তিকে প্রকাশিত এই তিনটি কবিতা সজনীকান্তের মনের নিগূঢ় জটিলতাকেই শুধু প্রকাশ করছে না, কবিগুরু সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপটিকেও উদঘাটিত করেছে।" ('রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ১০২)

১৩০৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যার পরে 'শনিবারের চিঠি'র প্রকাশ কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়। 'শনিবারের চিঠি' পুনঃপ্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় 'পরিচয়' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৫ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের পারস্য-যাত্রার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ক্লান্ত শরীর ও ডাক্তারি পরামর্শ অনুযায়ী রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে দার্জিলিঙে নিয়ে যান। সেখানে কবি মাসখানেক ছিলেন। এবং জুলাই মাসের গোড়াতেই শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছিলেন।

দার্জিলিঙে থাকাকালীন কবির সঙ্গে সেখানে নজরুল ইসলাম, নাট্যকার মন্মথ রায় ও শিল্পী অখিল নিয়োগী সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—"নজরুল মুখপাত্র হইয়া একটা বড় রকমের দল লইয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে যান ; রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে পাইয়া খুবই খুশি, বহুক্ষণ নানা বিষয়ের আলোচনা হয়।" ('রবীন্দ্রজীবনী' ৩, পৃ. ৪০৩) এই আলোচনা বিষয়ে কাজী নজরুল ইসলাম একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের 'স্বদেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির কিয়দংশ উদ্ধৃত হল—

"কবি হেসে বললেন, সজনে গাছকে কোনো রকমেই উপেক্ষা করা চলে না, কেমন চমৎকার ফুলঝুরির মতো ফুল সেজে থাকে। ...কবি হাসতে হাসতে বললেন, এই রকম আর একটি জীবনের নাম করা চলে— দেখতে সে বেশ সুশ্রী ; কিন্তু সেও ঠিক ওই কারণে সাহিত্যের আসরে একেবারে একঘরে হয়ে আছে।

"আমরা সবাই উৎসুক হয়ে উঠলুম। তিনি মুখ টিপে বললেন, মুরগী।"

'শনিবারের চিঠি'র প্রচ্ছদে একটি মুরগীর ছবি থাকত। অতএব 'সজনে গাছ' ও 'মুরগী' প্রসঙ্গ সজনীকান্তকে যে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত করবে তা অবশ্যম্ভাবী।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে 'শনিবারের চিঠি' পুনঃপ্রকাশিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্ত ও শনিগোষ্ঠীর প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন ছিলেন। 'প্রবাসী' প্রেস থেকে 'শনিবারের চিঠি'র মুদ্রণকার্য বন্ধ হওয়াতেও তাঁর রাগ পড়ে নি। উপরন্তু তাঁরই স্নেহধন্য পত্রিকা 'পরিচয়'কে 'শনিবারের চিঠি'-র দল নবপর্যায় প্রকাশিত হওয়ার কাল থেকে বিরোধিতা করছে। ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ আরো ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর ছয়টি কবিতা ও দিলীপকুমার রায় তাঁর কয়েকটি কবিতার অংশবিশেষ আপন আপন মন্তব্য সহ রবীন্দ্রনাথকে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। কবির সেই কবিতাগুলি পড়ে ভালো লেগেছিল। এবং তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাটুকুকে প্রবন্ধকারে রূপ দিলেন। প্রবন্ধটি 'নবীন কবি' শিরোনামে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের কার্তিকের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি 'শনিবারের চিঠি'র প্রতি ইঙ্গিত ক'রে 'সাহিত্যিক মোরগের লড়াই' কথাটা ব্যবহার করলেন, এবং এইসঙ্গে লিখলেন, "এই লড়াইয়ে কোনোদিন আমি যোগ দিই নি, যদিও খোঁচা অনেক খেয়েচি।"

এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত লিখেছেন—। "আমাদের বয়স ছিল কম, রক্ত ছিল গরম। পূর্বের "সজনে ফুল" ও "মুরগী"'র ঘা মনে ছিল, নূতন করিয়া "সাহিত্যিক মোরগের" উপমা তাহাতেই জ্বালা ধরাইয়া দিল।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩৪৫)

এই জ্বালার ফলে সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি' মাঘ ১৩৩৮, 'জয়ন্তী'-সংখ্যায় শালীনতার সীমা শোচনীয়ভাবে লঙ্ঘন করেন। এই সংখ্যার গোড়ায়, মোহিতলাল মজুমদারের 'কবি-বরণ' নামে একটি প্রশস্তি কবিতা ও সমাপ্তিতে সজনীকান্তের 'রবীন্দ্রনাথ' নামে আরও একটি প্রশস্তি কবিতা ছাড়া প্রতিটি লেখাই তীব্র, তীক্ষ্ণ, উগ্র ব্যঙ্গ বিদূষণে পূর্ণ।

'জয়ন্তী' সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'র প্রকাশের পূর্বে ১৩৩৮ অগ্রহায়ণে 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত লিখলেন 'জয়ন্তী' কবিতা। এই কবিতাটিও তীব্র-ব্যঙ্গবিদ্রূপে পরিপূর্ণ।

জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশের পরেও বহুদিন ধরে 'শনিবারের চিঠি'তে রবীন্দ্র-বিদূষণ অব্যাহত ছিল। "সবচেয়ে ক্ষতি-কারক ছিল পত্রিকা-র প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে মোহিতলাল মজুমদারের

লেখাগুলি। গুরুগম্ভীর সমালোচনার নামে মোহিতলাল সুকৌশলে রবীন্দ্র-বিরোধিতা মাসের পর মাস চালিয়েছিলেন।" ("রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত", পৃ. ১১১)

এই বিদ্রূপের ফলাফল নিয়ে সজনীকান্তের মন্তব্য লক্ষণীয়— "আমাদের আহত ভক্তি ও অভিমানটাই যে ব্যঙ্গ-বক্রোক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল, এই সহজ কথাটা সাধারণ পাঠক তো বুঝিলই না, রবীন্দ্রনাথও বুঝিয়াও বুঝিলেন না। ব্যবধান দুস্তরতর হইয়া উঠিল।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩৪৫)

ঙ। "রাজহংসের কবি সজনীকান্ত"

১৩৪২ বঙ্গাব্দের চৈত্র-মাসে সজনীকান্তের 'রাজহংস' কাব্য-গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। ষণ্মাত্রিক ধ্বনিপ্রধান মুক্তবন্ধ ছন্দে রচিত 'রাজহংস'। 'রাজহংস' প্রকাশিত হওয়ার পরে সজনীকান্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রমথনাথ বিশীর অনুরোধে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি বই পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় সজনীকান্তের 'শনিবারের চিঠি'তে রবীন্দ্র-বিদূষণের কারণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বহুদিনের ব্যবধান তৈরি হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও বন্ধুর অনুরোধকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নি সজনীকান্তের পক্ষে।

এই সম্পর্কে সজনীকান্ত লিখেছেন—পুস্তক প্রেরণের সপ্তাহকাল মধ্যে তিনি [প্রমথনাথ বিশী] তাঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত পত্রটি আমার নাকের উপর ধরিয়া প্রনাবিক হাসি হাসিলেন।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪৬১)। পত্রটির কিয়দংশ উদ্ধৃত হল :—

"২৯ এপ্রিল, ১৯৩৬

ওঁ

'Uttarayan'
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়েষু,

অভিমত দিতে আমি একান্ত নারাজ— ভালোই বলি আর মন্দই বলি এতে দেশের দুর্ম্মুখকে জাগিয়ে তোলা হয়।...

তোকে গোপনে বলি, রাজহংস বইখানি ভালো হয়েছে।..."
('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪৬২)

রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব সুধীরচন্দ্র কর -লিখিত 'রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র জীবন' ('যুগান্তর' শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫৫) শীর্ষক নিবন্ধে, তিনি সেই দিনের কথা লিপিবদ্ধ করেন। তারই কিছু অংশ উদ্ধৃত হল—"১৩৪৩ সনের বৈশাখ। চলছে কবির 'পত্রপুট' কাব্যের পালা।... কবি তখন "কোণার্ক"-বাসী। "কোণার্ক" গৃহের বারান্দার সামনে যে শিমুল গাছটি আছে, তার তলায় বসেছেন কবি সকাল বেলার কাজে। খ্যাতনামা সাহিত্যিকের কাব্যোপহার ['রাজহংস'] এসে পৌঁছেছে হাতে, সেই ডাকেই। প্যাকেট থেকে বই খুলে উল্টেপাল্টে দেখলেন। হঠাৎ বললেন, 'আমি পারি নি, কিন্তু এ পেরেছে, যা বলতে চেয়েছি— এর মধ্যে দেখছি কত সবল সুন্দর তার প্রকাশ।"

উত্তরকালে সজনীকান্ত 'আত্মস্মৃতি'তে 'রাজহংস' সম্বন্ধে লিখেছেন —"রবীন্দ্রনাথের সেই প্রশংসা-দিয়া-কাড়িয়া-লওয়ার ব্যবস্থায় মনে কিঞ্চিৎ বেদনা মিশ্রিত গ্লানি অনুভব করিয়াছিলাম, ফলে 'রাজহংসে'র কোনও প্রশংসাপত্রই বাজারে দাখিল করি নাই।" তৎসত্ত্বেও 'প্রবাসী'তে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় -লিখিত প্রশস্তি ও অন্যান্য স্থানে

'রাজহংস' প্রভৃত প্রশংসিত হয়। কিন্তু সজনীকান্তের কাছে এই সকল প্রশংসার কোনোটিই রবীন্দ্রনাথের সেই "তোকে গোপনে বলি, রাজহংস বইখানি ভালো হয়েছে"র বর্ম ভেদ করে তাঁর মর্মে প্রকাশ করতে পারে নি। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪৬৫)

চ. কাব্য-পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত

১৯৩৮, ১৩ জুন রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বাংলা-কাব্য পরিচয়' শীর্ষক বাংলা কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কবিতার প্রাথমিক নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন, বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের তৎকালীন কর্মকর্তা কিশোরীমোহন সাঁতরা ও হিরণকুমার সান্যাল। তাঁদের সহকর্মীরূপে নিযুক্ত ছিলেন কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৭ সালে কবিতা সংগ্রহ ও নির্বাচনের কাজ হয়। এবং ১৯৩৮ সালে গ্রন্থটির মুদ্রণকার্য শুরু হয় ও জুনের মাঝামাঝি সংকলনখানি প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং 'নন্দগোপাল সেনগুপ্ত' লিখেছিলেন পরিশিষ্ট।

এই কাব্য-সংকলনের প্রাথমিক স্তরে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল প্রভূত। প্রাথমিক নির্বাচনের পর কবি কবিতাগুলি সম্বন্ধে তাঁর চূড়ান্ত মতামত দিতেন। আদিযুগের কবিদের নিয়ে কোনো অশান্তি না হলেও আধুনিক কালের কবিদের নিয়ে শুরু হয় অশান্তি। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় যে সংকলন, সেখানে সকলের প্রতি সমান সুবিচার যেমন অনিবার্য তেমনি সংকলনের মানও হতে হবে উচ্চদরের। রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। পরিশিষ্ট লিখেছিলেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, কবি সম্পাদকীয় কাটছাঁট করে তাকে মুদ্রণযোগ্য করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—"হেমচন্দ্র ও বৈষ্ণব কবি সম্বন্ধে কাব্য

পরিচয়ের পরিশিষ্টে তোমার অভিমত পড়ে প্রকাশক-সঙ্ঘ বিচলিত হয়েছেন। তাঁরা বলেন এতে বাঙালী পাঠক অশান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়বে...।"

এতৎসত্ত্বে শুধু পরিশিষ্টই নয়, রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত ও সুলিখিত ভূমিকাটিও তীব্র বিদ্রূপ-সমালোচনায় আক্রান্ত হয়।

এই সব কারণে কিছুদিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের ভিন্নরূপ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সূচনায় সংযোজিত হয় 'নিবেদন'। 'নিবেদন'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"...অনেক কবিতা চোখে পড়েনি। অনেক নির্বাচন যোগ্যতর হোতে পারত। যে সংকলনে রচয়িতারা স্বয়ং তৃপ্ত হননি তাদের নির্দেশ পালন করলে হয়তো তা সন্তোষজনক হবার সম্ভাবনা থাকত।

আধুনিক কবিতার ধারা অবিরাম বয়ে চলেছে, সুতরাং তার সংগ্রহ ভাবী সংস্করণে পূর্ণতা ও উৎকর্ষ লাভ করবে এই প্রত্যাশা সংকলন কর্তার মনে রইল।"

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে 'বাংলা কাব্য-পরিচয়'-এর যে কপিটি সংরক্ষিত রয়েছে তার উপর একটুকরো কাগজে সুধীরচন্দ্র করের স্বাক্ষরে লিখিত রয়েছে— "প্রথম সংস্করণেই প্রথমত এই বই একরকম ছাপা হয়ে বাজারে বেরিয়েছিল পরে সংশোধন হয়ে আবার নতুন করে বেরয়। এইখানাই সংশোধিত কপি" স্বাঃ সুধীরচন্দ্র কর ২৬-৭-৩৮।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় খসড়ায় ব্যাপকভাবে আধুনিক কবিদের রচনা যোগ করেন। এই শেষের অংশ নিয়ে বইখানি প্রকাশিত হলে বুদ্ধদেব ও অন্যান্য সমালোচকেরা প্রধানতঃ নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন। ("বাংলা কাব্য-পরিচয় প্রসঙ্গে" রবীন্দ্রচর্চা, তৃতীয় সংখ্যা ১৯৯৮, পৃ. ৭৬-৮০)

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের ‘কবিতা’ পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর কাব্য-পরিচয় সম্পর্কে সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—“এই সংকলন গ্রন্থের দায়িত্ব বৃহৎ, তা রবীন্দ্রনাথ না করলে কে আর করবে? গুরুদেবের কাছে আমাদের প্রার্থনা এই যে তিনি নিজে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বাংলা কবিতার প্রামাণ্য সংকলন গ্রন্থ রচনা করুন। মন্দকে নির্মমভাবে বিতাড়িত ক'রে ও ভালোকে তেমনি নির্লজ্জভাবে গ্রহণ ক'রে তিনি এমন একটি বই করুন যাতে বহু যুগ ধরে বাঙালী কবি ও পাঠকের বুদ্ধি বিকশিত ও রুচি গঠিত হতে পারে।” (“বাংলা কাব্য-পরিচয়”, কবিতা ত্রৈমাসিক, ১৩৪৫ আশ্বিন, পৃ. ৭৪)

সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত নব সংস্করণ কাব্য-পরিচয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় পঞ্চ-সদস্যের একটি সহায়ক পরিষৎ গঠিত হয়েছিল। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ছাড়া এই পরিষদের অন্য চারজন সদস্য হলেন— সজনীকান্ত দাস, হিরণকুমার সান্যাল, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও কিশোরীমোহন সাঁতরা। সহায়ক পরিষদের সদস্য পঞ্চকের মধ্যে সজনীকান্তই একমাত্র নবাগত ছিলেন। নির্মমভাবে রবীন্দ্র-বিদূষণের পরেও সজনীকান্তকে কেন রবীন্দ্রনাথ এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন— এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই প্রত্যেকের মনে সংশয় জাগাবে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন— “বই [কাব্য-পরিচয়] প্রকাশিত হবার অল্প পরেই যে সংকট, তখনই শুরু হয়েছিল সজনীকান্তের আসা-যাওয়া।” (‘উর্বশীর হাসি’, পৃ. ২৩)

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে সজনীকান্তের সঙ্গে বিশ্বভারতীর প্রকাশনালয়ের যোগসূত্রের সূচনাকাল ১৯২৪। এবং তখন থেকেই বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে সজনীকান্ত

বিশ্বভারতীর কলকাতাস্থ কার্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সজনীকান্তের 'আত্মস্মৃতি'-তে রয়েছে—১৩৩২ এ 'পূরবী' প্রকাশকালে, সেই সময়ে সজনীকান্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে তাঁর পুরাতন সংগ্রহের ঝুলি থেকে রবীন্দ্রনাথের 'হারিয়ে-যাওয়া' কবিতাগুলি সরবরাহ করেছিলেন।

এ ছাড়া ১৯২০ সনে 'অক্সফোর্ড বুক অব বেঙ্গলি ভার্স'-এর যে পরিকল্পনা হয়েছিল, তার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। সেই সময়েও সজনীকান্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে উপকরণ সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।

কাব্য-পরিচয়ের কবিদের ঠিকানা সাগ্রহে তিনি জোগাড় করে দিয়েছিলেন সে ঘটনার উল্লেখ কিশোরীমোহন সাঁতরার রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে পাওয়া যায়, তবে তার সময়কাল বোধহয় ১৯৩৭।

রবীন্দ্রনাথ 'কাব্য-পরিচয়'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য অনেক বেশি নির্ভর করেছিলেন সজনীকান্তের ওপরে। প্রমাণস্বরূপ তাঁকে লেখা এলাহাবাদের কোনো আধুনিক মহিলার লিখিত পত্রের ওপর, রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য লিখে সজনীকান্তের মতামত চেয়েছিলেন— কবির মন্তব্যসহ মূল চিঠিটির অংশবিশেষ এখানে দেওয়া হল—"আমার মনে হয় "বাংলা কাব্য পরিচয়ে" অতুলপ্রসাদ সেন, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, গুরুসদয় দত্ত প্রভৃতির কবিতাও স্থান পেতে পারত। "বনফুল", কাজী নজরুল ইসলাম ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতা আরও কয়েকটি হ'লে বইটি বোধহয় আরও সুন্দর হোত। আপনার কবিতাগুলির মধ্যে "পুনশ্চের" "সাধারণ মেয়ে"টিকে দেখ্‌তে পাব আশা ছিল ; পরবর্তী সংস্করণে আশাকরি সে আশা পূর্ণ হবে। "কিনু গোয়ালার গলি" যে কত সুন্দর লেগেছে তা আপনাকে জানাতে পারলে ধন্য হতুম।

"লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা"র দ্বিতীয় বই কি হবে জানিনা। যদি এবার বাংলা গল্পের একটি সংকলন করা হয়, আশাকরি তা খুবই মনোজ্ঞ হবে। বাংলা ভাষার উৎকৃষ্ট উপন্যাসগুলিকে সঙ্কিক্ষপ্ত [সংক্ষিপ্ত] করে সঙ্কলন করলেও একটি খুব সুন্দর বই হয় যদিও তাতে মূল উপন্যাসগুলির সৌন্দর্য কিছু ক্ষুণ্ণ হতে পারে। উপস্থিত যদি বাংলা ছোটগল্পের একটি "পরিচয়" প্রকাশ করা হয় তাতে যে সকলের বিশেষ উপকার হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।" মূল চিঠির পাশে রবীন্দ্রনাথের "কী বলো তুমি?" এবং প্রথম প্যারার নামের তলায় লাইনগুলির বিশেষ ইঙ্গিত— বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না।

কাব্য-পরিচয় সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের মধ্যে যে পত্রালাপ হয় তার উল্লেখ ও বিশ্লেষণ বিস্তারিত ভাবেই এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়ে রয়েছে। তবে আবার অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষের লেখায় ফিরে আসি— অধ্যাপক ঘোষ লিখেছেন—"এই দ্বিতীয় সংস্করণটি যদি ছাপা হতো শেষ পর্যন্ত, তাহলে স্পষ্টতই সেটা হতো সজনীকান্তের সংকলন, রবীন্দ্রনাথ হতেন শিখণ্ডী। এরই খবর নিশ্চয় ছড়িয়ে পড়েছিল গুজবের চেহারায়, যার নমুনা আমরা ধরতে পারি সমর সেনের স্মৃতিচারণে।" ('উর্বশীর হাসি', পৃ. ২৪)

সমর সেনের 'বাবু বৃত্তান্ত' আদ্যোপান্ত পাঠোদ্ধার করেছি। তিনি অবশ্যই লিখেছেন—"অনেকে হয়তো জানেন না যে তিরিশ দশকের শেষাশেষি রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার একটি সঙ্কলন বের করেন (জোর গুজব সজনীকান্ত দাসের সহযোগিতায় ও পরামর্শে)।[১]" ('বাবু বৃত্তান্ত', পৃ. ২৭)

এইবার উক্ত গ্রন্থের ১নং পাদটীকাটি লক্ষণীয়— "১। প্রকৃত পক্ষে উক্ত সংকলনটির সম্পাদনায় সহযোগী ছিলেন শ্রীকাননবিহারী

মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। শ্রীসজনীকান্ত দাশ ছিলেন না। এই সংকলনটির বিক্রি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নতুন একটি সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। আর তারই দায়িত্ব ছিল সজনীকান্ত দাশের উপর। কিন্তু ঐ সংস্করণ শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।" ('বাবু বৃত্তান্ত', পৃ. ৭৫)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সমর সেন -উল্লেখিত পৃ. ২৭-এর 'শ্রীসজনীকান্ত দাস' ও পৃ. ৭৫-এর 'শ্রীসজনীকান্ত দাশ' এক ব্যক্তি কি? সনাক্ত করা সম্ভব হল না। আমার দুর্ভাগ্যবশত সমর সেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি তাই এই প্রশ্ন বর্তমান পাঠকের কাছেই পেশ করলাম।

"সেটা হোতো সজনীকান্তের সংকলন" অধ্যাপক ঘোষের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমি রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি চিঠি এখানে উল্লেখ করছি। রবীন্দ্রনাথ ১৭/৯/৩৮ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লিখছেন— "কাব্য পরিচয় সম্বন্ধে সজনীকে তাগিদ কোরো। একবার খসড়াটা আমার কাছে দাখিল কোরো। কারণ যখন আমার নাম থাকবে তখন দায়িত্ব আমার।" বাকিটা পাঠক বিচার করবেন।

ছ. রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রাবণ ভক্ত

সজনীকান্তের দীর্ঘ সাহিত্যজীবনকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা চলে। প্রথম যুগে তাঁর মন্ত্র ছিল অশিববিনাশ। দ্বিতীয় যুগে তাঁর স্বপ্ন ছিল নবসৃষ্টি। তৃতীয় যুগে তাঁর লক্ষ্য হল ইতিহাসের অবলুপ্ত কক্ষের সত্যের সন্ধান। ('রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ১৫১)

'শনিবারের চিঠি'র জন্মের উষালগ্নে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁদের একমাত্র বলভরসা। কিন্তু তার পরবর্তী ইতিহাস বড়ো বিচিত্র।

১৩৩৪-এ 'নটরাজ' পর্ব ধরে এই গুরুদ্রোহ যাত্রার শুরু হয়। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন থেকে 'শনিবারের চিঠি' নবপর্যায় প্রকাশিত হয়। এবং তখন থেকে ১৩৪৫ অবধি দীর্ঘ দশ বছর ধরে চলে তীব্র রবীন্দ্র-বিদূষণ পর্ব। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য এই পর্বকে 'গুরুদ্রোহ' শিরোনামে অভিহিত করেছেন। ১৩৪৫ থেকে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, সজনীকান্তের জীবনের শেষ চব্বিশ বছরকে বলা চলে রবীন্দ্রানুশীলন পর্ব। এই শেষের চব্বিশ বছরের মধ্যে প্রথম তিন বছর— অর্থাৎ ১৩৪৫-৪৮ রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশার শেষ তিনটি বছর গুরুশিষ্যের সম্পর্ক এক অদ্ভুত অন্তরঙ্গ গভীরতা লাভ করে। এবং পরবর্তী একুশ বছর অর্থাৎ ১৩৪৮-৬৮ সজনীকান্ত রবীন্দ্রচর্চায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন।

কাব্য-সরস্বতীর হাত ধরে রবীন্দ্রনাথের চরণপ্রান্তে যখন স্থান পেয়েছিলেন সজনীকান্ত তখন থেকেই তিনি ক্রমশ হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথের খুবই কাছের একজন। সেই সময়ের কথা স্মরণ করে সজনীকান্ত লিখেছেন— "আমার প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতি তখন অনেকেরই বিক্ষুব্ধ আলোচনার বিষয় হইয়াছিল।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ২৯৭)

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন— 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের পুনর্মিলন যে সদাচার সম্মত সৌজন্যের স্তর পেরিয়ে সারস্বত ক্ষেত্রেও নিগূঢ় যোগাযোগ সৃষ্টি করেছিল তার একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮ সালের নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা ভাষা-পরিচয়' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ...এই গ্রন্থে একটিমাত্র সূত্র নির্দেশক পাদটীকা আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের ৫৪ পৃষ্ঠায় "পুরোনো বাংলা গদ্যের একটু নমুনা" উদ্ধৃত আছে। এই উদ্ধৃতির সূত্রনির্দেশ করা আছে পাদটীকায়। রবীন্দ্রনাথ

লিখেছেন, "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস লিখিত বাংলা গদ্যের প্রথম প্রবন্ধ থেকে তুলে দেওয়া হোলো।" পরবর্তী পৃষ্ঠায় "ঈশ্বর গুপ্তের আমলে বঙ্কিমের কলমে যে গদ্য দেখা দিয়েছিল" তারও নমুনা রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছেন "সজনীকান্ত দাসের প্রবন্ধ থেকে"। ('রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ১৫৮)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ কিশোরীমোহন সাঁতরাকে ২৮/৮/৩৮ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে একটি চিঠিতে লিখেছেন —"তোমাদের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলুম। সজনীকে আমার একটা বিষয়ে দরকার ছিল— যে বইটি লিখচি তার জন্যে। বঙ্কিম যখন ঈশ্বর গুপ্তের আসরে প্রথম হাত পাকাচ্ছিলেন সেই সময়কার একখণ্ড গদ্য, লাইন আট-দশ পাঠিয়ে দিয়ো। দেরি কোরো না, লেখা আট্‌কে আছে।"

সজনীকান্ত ছিলেন একদিকে নবযুগের কবি আবার বিগত যুগের গবেষক। সাহিত্যের অবলুপ্ত ইতিহাসের সত্যের অনুসন্ধান ও কালজয়ী সাহিত্য-পাঠকদের কীর্তিরক্ষা তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। তিনি ছিলেন সাহিত্যের উত্তর সাধক। বৈষ্ণব পদাবলীর একখানি প্রাচীন পুথিকে অবলম্বন করে সজনীকান্তের সাহিত্য গবেষণার সূত্রপাত। 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদনার সময়ে সজনীকান্ত নিয়মিতভাবে গবেষণাকর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর পথপ্রদর্শক ও সহযোগী ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে কোনো কাজেই সজনীকান্তের সম্পূর্ণ হত না। ১৯৩৮-৩৯ সালে সজনীকান্ত পুরাতন সাময়িক পত্রিকা অর্থাৎ জ্ঞানাঙ্কুর, প্রতিবিম্ব, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভারতী, সাধনা প্রভৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের নামী ও বেনামী রচনাগুলির একটি সবিবরণী তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন এবং তা পত্রযোগে ১২ অক্টোবর ১৯৩৯ রবীন্দ্রনাথের

কাছে প্রেরণ করেছিলেন। কবি তখন মংপুবাসী। ওই তালিকাবদ্ধ রচনাগুলি যে একান্তভাবে 'কবির'ই তা স্বয়ং কবিকে দিয়েই যাচাই করে নেওয়া— এই ছিল সজনীকান্তের বাসনা। প্রসঙ্গত কবি-অনুমিত তালিকা ক্রমান্বয়ে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের (কার্তিক-চৈত্র) 'শনিবারের চিঠি'তে "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী" এই শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তা সজনীকান্তের রচিত 'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে ২২ নবেম্ভর কলকাতার সংবাদপত্রে 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা' আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশিত হয়। আবিষ্কর্তার নাম সজনীকান্ত দাস।

২১ নবেম্বর ১৯৩৯ সজনীকান্তের জীবনের এক ঐতিহাসিক স্বর্ণসন্ধ্যা। এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত লিখেছেন— "রবীন্দ্ররচনার নষ্টোদ্ধার ছাড়াও সেদিন তাঁহাকে একখানি বই একটি চিঠি দেখাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। দুইটি বস্তুই কলিকাতার ফুটপাথে সংগ্রহ করা। বইটি হইতেছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে উপহার দেওয়া কবি বিহারীলালের গ্রন্থাবলী, বিহারীলালের স্বাক্ষর সম্বলিত। দাতা ও গ্রহীতার গৌরবেই বইখানির চরম গৌরব নহে। বালক রবীন্দ্রনাথ বইখানি পড়িয়াছিলেন এবং বইয়ের মার্জিনে বিভিন্ন মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।... চিঠিখানি পাইয়াছিলাম রবীন্দ্রগ্রন্থ সত্যেন্দ্রনাথের স্বব্যবহৃত মহর্ষির আত্মজীবনীর মধ্যে। প্রথম বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে বোম্বাইয়ে যে কিশোরী রবীন্দ্রনাথকে ভাল ইংরেজী শিখাইতে বসিয়া নিজেই ভাল বাংলা শিখিয়াছিলেন ও সেই সময় 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'কবি-কাহিনী' (১৮৭৮ সনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত) যিনি সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে নলিনী নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথ কিছু গান ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, চিঠিটি ১৮৭৮ সনে তিনিই লিখিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের

কোনো অগ্রজকে। তিনি বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ডাক্তার দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গের কন্যা অ্যানা। বস্তু দুইটি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রায় আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং সেই সন্ধ্যাতেই স্বহস্তে একখানি ছবি, তাঁহার ব্যবহৃত একটি আলখাল্লা এবং 'তপতী' নাটকে অভিনয়কালে তৎকর্তৃক পরিহিত শিরস্ত্রাণটি আমাকে দান করিয়া ধন্য করেন।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৩৬)

শুধু 'অভিলাষ'ই নয় সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের আরেকটি অনামা বাল্যরচনা আবিষ্কার করেছিলেন— 'প্রকৃতির খেদ' নামক একটি দীর্ঘ কবিতা।

রচনাপঞ্জী আবিষ্কার সম্পর্কে সজনীকান্তের কৃতিত্বের একটি পাকা দলিল, রবীন্দ্রনাথ লিখে দিয়েছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ২৪)

এই নষ্টোদ্ধারের ফলে রবীন্দ্রনাথ এমনই খুশি হয়েছিলেন যে সজনীকান্ত অচিরাৎ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'-র সম্পাদকমণ্ডলীভুক্ত হয়েছিলেন। অক্টোবর থেকে খণ্ডে খণ্ডে যা প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। প্রথম খণ্ডে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র পূর্বে রচিত যাবতীয় কাব্য এবং বহু প্রবন্ধ চিঠিপত্র ইত্যাদি পরিত্যক্ত হওয়াতে, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা কবির কাছে আবেদন জানান যে তাঁর রচনার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য তাঁর বাল্য ও কৈশোরের রচনাগুলিও গ্রন্থাবলীভুক্ত হওয়া আবশ্যক। কবি জোর গলায় বলেছিলেন যে তিনি ইতিহাসের ধারা মানেন না। অবশেষে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর 'অচলিত সংগ্রহ' অ্যাখ্যা দিয়ে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র কয়েকটি খণ্ড প্রকাশে অনুমতি দিলেন। 'অচলিত সংগ্রহ' প্রকাশে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল সজনীকান্ত ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। ১৯৪০ অক্টোবরে 'অচলিত সংগ্রহে' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। 'অচলিত সংগ্রহ' দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

রচনাবলী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থানেই সজনীকান্তের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন তার সাক্ষ্য মেলে রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের চিঠিপত্রের মধ্যে, এই গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

১৯৪০ জানুয়ারি মাসে সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনে কবিসকাশে উপস্থিত হলে রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে বিশ্বভারতীর আর্থিক দুরবস্থার কথা জানান। এবং এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশ্বভারতীর বেতন-ভোগী অমিয় চক্রবর্তীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনার কাজে নিয়োগ বিষয়ে সাহায্য করতে বলেছিলেন। সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের এই অনুরোধে সাড়া দিতে পেরেছিলেন বলে যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন তেমনি আবার ঝাড়গ্রাম-রাজের আর্থিক আনুকূল্য না পাওয়ায় দুঃখিত ও সংকুচিত হয়েছিলেন।

১৯৪০-এর এপ্রিল মাসে, ১ বৈশাখ, ২৫ বৈশাখের উৎসবের পরে রবীন্দ্রনাথ কালিম্পঙ যাত্রার উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসেছিলেন এবং কলকাতায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে বরানগরে ছিলেন।

কলকাতার ফুটপাথে পুরোনো বই সংগ্রহের এক নেশা ছিল সজনীকান্তের। সেখানেই তিনি পেলেন 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন, বেঙ্গল কালেণ্ডর ১৯০৬-৮"। বইটির পরিশিষ্টে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মুদ্রিত ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি বাংলা প্রশ্নপত্রের উপর লেখা রয়েছে—"Paper set by Babu Rabindranath Tagore"। রবীন্দ্রনাথকৃত এই প্রশ্নপত্র সম্পর্কে সজনীকান্তের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। কলকাতায় সেই সময় কবির কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সজনীকান্ত কবিসকাশে বই সমেত উপস্থিত হয়েছিলেন। এই প্রশ্নপত্রের সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথ সেদিন যা বলেছিলেন এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত

লিখেছেন— "স্বদেশী আমলে তাঁহার কর্মজীবন কিরূপ ছিল তাহা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের নৈষ্কর্ম্য[?] ও দুষ্কর্ম বাদের প্রভূত নিন্দা করিয়াছিলেন, ফলে সংবাদপত্রে প্রতিবাদ ও সমর্থনের বান ডাকিয়াছিল।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৪৭)। মূল সাক্ষাৎকার বৃত্তান্ত ১৩৪৭ সালের বৈশাখের 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে সজনীকান্তের 'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'কর্মী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে তা সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য ১৯৪০ সালের এপ্রিলের শেষ ভাগে বাংলা ও বাংলার বাইরে মূল বাংলায় ও ইংরেজি অনুবাদে বহু দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

১৯৪০ জুন, রবীন্দ্রনাথ এপ্রিলের শেষে কালিম্পঙ যাত্রাকালে শিয়ালদহ স্টেশনে সাক্ষাতের পর সজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর আর যোগাযোগ হয়নি। এইসময় সজনীকান্ত মারাত্মক ভাবে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে প্রায় শয্যাগত। ১ জুন ১৯৪০ সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে সমস্ত অবগত করে একটি পত্র লেখেন। উত্তর আসে ৩ জুন ১৯৪০। উদ্‌বিগ্ন কবি সজনীকান্তের শীঘ্র আরোগ্য কামনা করে চিঠি লিখেছেন কালিম্পঙ থেকে।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর কাছ থেকে সজনীকান্ত জানতে পেরেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যাধি সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে জানতে আগ্রহশীল। সজনীকান্ত তাঁর অসুখের ইতিহাস লিখে পত্রযোগে কবির কাছে পাঠালেন ও সেইমতো 'ব্যবস্থাপত্র' এল (৬ জুন ১৯৪০)। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আমার ডাক্তারির পক্ষে বলবার কথা এই যে, সাংঘাতিকতায় আমার ওষুধ ব্যামোকে ছাড়িয়ে যায় না। বায়োকেমিক বইটা ঘেঁটে দেখছিলুম যে ঐ চিকিৎসার মতে নেট্রাম সাল্‌ফ ডায়াবেটিসের প্রধান ওষুধ।... অন্য ওষুধের সঙ্গে এর ব্যবহার চলে, অন্তত আমি তো ব্যবহার করেছি। দিনে তিনবার খেলে আপত্তি করে না, অ্যাকিউট ব্যাধিতে সেইটেই ব্যবস্থা।"

সজনীকান্ত বায়োকেমিক বিদ্যা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে পারিবারিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুফলও পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ২৮ জুন ১৯৪০ সজনীকান্তের লেখা একটি চিঠি পেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কবির উত্তর আসে [৩০ জুন ১৯৪০] তারিখে লেখা একটি চিঠিতে। কবি লিখেছেন— 'আমার ওষুধে ফল পেয়েছ। বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন। যে বয়সে স্বভাবতই অন্য খ্যাতির বালিচাপা পড়ে, সেই বয়সে তিনি একটা নতুন পথ খুলে দিলেন। আমার জীবনচরিতের শেষ অধ্যায়ে এই খবরটা দিয়ে যেতে পারবে।..."

রবীন্দ্রনাথ ২৮ জুলাই ১৯৪০ শান্তিনিকেতন থেকে সজনীকান্তকে লিখেছেন— "... তোমার কাজের মহলে একটা ডাক্তারি খিড়কির দরোজা হঠাৎ খুলে গেল— এর জন্যে দায়ী আমি। আশা করি কোনো পরিতাপের কারণ ঘটবে না। ভাল আছ বলে আন্দাজ করছি। চুপচাপ থাকাটা একটা খবর— ওটা আরো কিছুদিন বড় হেডলাইনে জাহির কোরো।..."

ভাদ্র, ১৩৪৭, সজনীকান্তের দুটি বই প্রকাশিত হয়— 'কলিকাল' ও 'কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল'। সদ্য প্রকাশিত বই দুটি সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ে ১০/৯/১৯৪০ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—"শরীরটা অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন। তোমার বই দুটি পেয়েছি।...অক্টোবরের আরম্ভে পাহাড়ে পালাবার ইচ্ছা করছি। যাবার মুখে কলকাতায় দেখা হতে পারবে।..."

এই চিঠি লেখার অব্যবহিতকাল পরে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছিলেন। সজনীকান্ত সেই সময় সাহিত্য-সভার সভাপতিত্বের দায়ে ভাগলপুরে গিয়েছিলেন। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪০, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তার যোগে জরুরি তলব আসে। তৎক্ষণাৎ ফিরে এসেছিলেন সজনীকান্ত। উত্তরকালে সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছেন—

'...পরদিন ১লা আশ্বিন ১৭ই সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে নয়টায় কলিকাতা পৌঁছিলাম। অপরাহ্নে[হ্ণ] টেলিফোনে জোড়াসাঁকোয় খবর করিতেই সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান আসিল। বেলা চারিটায় পৌঁছিলাম, তাঁহাকে সুস্থ দেখাইতেছিল না, চোখ এবং কান খুবই খারাপ হইয়াছে, তবু দেখি প্রস্তুত হইয়া আছেন—তাঁহার সদ্য-লেখা "ল্যাবরেটরি" গল্প আমাকে পড়িয়া শুনাইবেন। আমি শঙ্কিত হইলাম, তাঁহার পরিজনদের কাছে কেমন একটা সঙ্কোচও বোধ হইতে লাগিল, তবু শুনিতে হইল। দেখিলাম, এই বয়সে অসুস্থ শরীরে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এক নারী চরিত্র সোহিনীর আবির্ভাব হইয়াছে। আমার কথায় কবি ছেলেমানুষের মতো খুশী হইয়া উঠিলেন।' ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৫৫)

যদিও চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'অক্টোবরে পাহাড়ে পালাবার' কথা লিখেছিলেন কিন্তু বিকল দেহ ও চঞ্চল মনে তাঁর পক্ষে কলকাতায় থাকা সম্ভব হয়নি। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪০, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী সমভিব্যাহারে কালিম্পঙের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। মাত্র সপ্তাহকাল অতিবাহিত হতে-না-হতেই প্রচণ্ড ইউরিমিয়ার প্রকোপে আক্রান্ত হয়ে কবিকে শয্যাগত অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল কলকাতায়। জোড়াসাঁকোর 'পাথরের ঘরে' একমাসের অধিককাল কবি জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে প্রায় আচ্ছন্নের মতো ছিলেন। ১৮ নবেম্বর ১৯৪০ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অবস্থাতেই কবি সৃষ্টি করলেন— 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'গল্পসল্প'।

সজনীকান্ত ১৯৪০ নবেম্বর থেকে ১৯৪১ মে এই ছয় মাস সভাসমিতি নিয়ে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ভ্রমণে ব্যস্ত ছিলেন। তবু এরই মধ্যে ১৯৪১ জানুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনে গিয়ে

কবিসকাশে উপস্থিত হয়েছিলেন।'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন — '৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪১ একবার বোলপুর গিয়া কবিকে অনেকটা সুস্থই দেখিয়া আসিয়াছিলাম।'

এই প্রসঙ্গে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী তাঁর "রবীন্দ্র দৈনিকী"তে ৭/১/৪১ তারিখে রচিত, লিখেছেন— "আজ সকালে "শনিবারের চিঠি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এবং শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া কবিকে প্রণাম করিতেই রবীন্দ্রনাথ সজনীবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তুমি এলে এ্যাকেবারে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। আমি ভেবেছিলুম ধীরে সুস্থে আসবে। যাক, আশাকরি তোমাদের থাকার ব্যবস্থাদি ভালো রকমই হয়েছিল, কোনো রকম কষ্ট হয়নি"। সজনীবাবু বল্লেন "কিছু কষ্ট হয়নি, বেশ আরামেই ছিলেম। চিঠিতে যেই টের পেলুম আপনি আমার মৌন সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছেন, অমনি চলে এলুম কিছুমাত্র বিলম্ব না করে, সেইজন্যই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন কতটা আসা হোলো"। এর পর রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের মধ্যে সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রসঙ্গক্রমে ঐ আলোচনাতেই রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে প্রশ্ন করেছিলেন— আচ্ছা এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি, আমার "ল্যাবরেটরি" গল্পটি তোমাদের কেমন লাগল, আমার মনে হয় এর ঠিক মর্মকথাটি হয়তো অনেকেই ধরতে পারেনি।" সজনীকান্ত উত্তরে বলেছিলেন— "তিনসঙ্গী গ্রন্থে আপনার এই ল্যাবরেটরি গল্পটি পুনরায় পড়েছি। আপনার এ গল্পটি সম্বন্ধে নিন্দে প্রশংসা সমভাবেই হচ্ছে। যাঁরা ভাল করে আপনার সাহিত্য পড়েননি সেই শ্রেণীর সেকেলে দল আপনার এ গল্পের ভয়ানক নিন্দে করেছেন। আর যাঁরা এটা নিয়ে আহ্লাদে আটখানা হচ্ছেন অর্থাৎ তথাকথিত আধুনিকদের দল তাঁরাও এর বহিরঙ্গের চটকেই মুগ্ধ—শুধু মুগ্ধ তা নয়, তাঁদের এই মুগ্ধবোধকে নিজেদের সাহিত্যের অপসাধনায় ব্যবহার

করতে উৎসাহিত হয়ে উঠবেন। আমাদের মনে হয় আপনি সোহিনীর মধ্যে যেটি রক্তমাংসের উপরের মানুষ তাকেই দিয়েছেন শ্রেষ্ঠত্ব, আর সেই শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিই তাঁর স্বামীর ছিল পৌরুষময় শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। সোহিনীর মেয়ে সে পেয়েছিল মায়ের দেহ, যে দেহ বাসনায় জর্জরিত পায়নি মায়ের সেই নারী-চিত্ত, যেটা আদর্শ ও শক্তির প্রতীক, যার কাছে অধ্যাপক করেছিলেন মাথা নীচু, অধ্যাপকের বিশ্বাস ও মর্যাদাও রক্ষা করেছিল সোহিনী তার সেই অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েই।" "লাবরেটরি" গল্পের এই মর্ম্মকথা খুব কম লোকই ধরতে পেরেছে, তোমরা ঠিক ধরেছ বলে রবীন্দ্রনাথ হাসলেন"।

প্রসঙ্গত 'সাপ্তাহিক দেশ' অষ্টম বর্ষ ১১শ সংখ্যা, ১৩৪৭, ১৩ই মাঘ, সংখ্যায় পৃ. ৪৬৪, পুস্তক পরিচয় শিরোনামায় রবীন্দ্রনাথের 'তিনসঙ্গী' গল্পের বইটির সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচক সজনীকান্ত দাস।

১৩৪৮ বৈশাখে 'গল্পসল্প' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। "গল্পসল্প" প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক খণ্ড বই সজনীকান্তকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর মতামত জানতে চেয়ে। প্রচণ্ড অসুস্থতার মধ্যেও সজনীকান্ত বইটি পড়েছিলেন ও কবিকে তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ২৮/৫/৪১ তারিখে লিখলেন— 'সজনী, গল্পসল্প তোমার ভাল লেগেছে শুনে আমি খুশী হলুম। ওরকম খুচরো গল্প সাধারণত কারো কানে পৌঁছয় না, কিছু পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তুমি যে তার ঠিক মর্মটি ধরতে পেরেছ এতে তোমাকে সাহিত্যের সমজদার বলে চেনা গেল।"

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এই সংবাদে সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এই সময় মারাত্মক ডায়াবেটিসে সজনীকান্ত নিজের অবস্থাও

খুবই সঙ্গিন। একা যাওয়ার ক্ষমতা নেই, ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে, দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে, এবং গৃহিণীকে বলে গেলেন চন্দননগরে যাচ্ছি, ৩ জুন ১৯৪১ সকালের ট্রেনে রওনা হয়ে সকালে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করলেন। উত্তরকালে সজনীকান্ত লিখেছেন— "কবি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, কি করিয়া আমাদের আদর-আপ্যায়ন করিবে তাহা লইয়া সচিব ও অনুচরদের বিপন্ন করিয়া তুলিলেন। বৈকালের ট্রেনেই ফিরিয়া আসিলাম।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৫৭)

পরের দিন ৪ জুন ১৯৪১ রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে লিখলেন —"সজনী, তুমি ক্ষণকালের জন্যে এসে আমাদের খুশী করে দিয়ে গেছ। তোমার যে রকম ভঙ্গুর অবস্থা তাতে আমি এ প্রত্যাশা করিনি। প্রতীক্ষা করে রইলুম সুস্থ অবস্থায় আবার সম্মিলন হোতে পারবে।..."

সোয়া আট-মাস কাল শান্তিনিকেতনে কবি থেকেছিলেন। কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতির জন্যে তাঁকে ৯ শ্রাবণ ১৩৪৮ কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিয়ে আসা হল।

পরের দিন ১০ শ্রাবণ, ১৩৪৮, ২৬ জুন ১৯৪১, দুপুরে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী দূরভাষে সজনীকান্তকে বললেন— "যদি সজ্ঞানে কবিকে দেখতে চান এক্ষুণি আসুন।" সজনীকান্ত তখনই গেলেন জোড়াসাঁকোয়।

পরবর্তীকালে সজনীকান্ত লিখেছেন— "সুধাকান্তদার সহিত আমি কবির কাছে উপস্থিত হইতেই সেবারতা যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা উঠিয়া গেলেন। আমি প্রণাম করিতেই বসিতে বলিলেন। নিজে হইতেই অবনীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন : ওর জন্মদিন উপলক্ষ্যে (৭ই অগস্ট) তোমরা ঘটা করে উৎসব ক'রো। দেশের রুচির হাওয়া ও

একলাই বদলে দিয়েছে— এত বড় প্রতিভা ওর। একটা বড় সম্মান ওর প্রাপ্য।

প্রণাম করিয়া বিদায় লইবার মুখে বলিলাম আপনি শীগগির সুস্থ হয়ে উঠুন। তাঁহার মুখে ম্লান হাসি দেখা দিল, কষ্টের সঙ্গে বলিলেন, সেটা কি আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে।' ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৫৮।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষের চারদিন সজনীকান্ত আরও অনেকের সঙ্গে কবির আশেপাশেই ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে, আশ্বিন 'শনিবারের চিঠি'র রবীন্দ্রসংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখে প্রকাশিত হল সজনীকান্তের 'পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যগ্রন্থখানি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই গ্রন্থের স্বত্বার্জিত অর্থ কলিকাতাস্থ তৎকালীন রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রে দান করা হয়েছিল। সজনীকান্ত কবির প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন—তাঁর সারাজীবনের রবীন্দ্র-গবেষণার ফসল —'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি আজও রবীন্দ্র-গবেষকদের কাছে অপরিহার্য।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখের দাবি রাখে রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের বহুকাল পরে ১৩৫৯, মাঘ সজনীকান্তের 'ভাব ও ছন্দ' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সজনীকান্তের মাইকেলবধ-কাব্য সংকলিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশকালে সজনীকান্ত লিখেছেন— "মাইকেলবধ-কাব্য" 'শনিবারের চিঠি'র বিশেষ "কবিতা-সংখ্যা"য় (ভাদ্র, ১৩৪৪) সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক মাইকেল-বধ উপলক্ষ্যে ইহা রচিত হইলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রচনাটিকে সপ্রশংস আশীর্বাদ জানাইয়াছিলেন। পরে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি নিজের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমাকে জানান, একবার

মাঘোৎসবে রচিত আমার কয়েকটি গান শুনিয়া পিতা আমাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কৃত করিয়া বলিয়াছিলেন, দেশের রাজার কাছে যদি এ দেশের সাহিত্যিকদের আদর থাকিত তাহা হইলে কবিকে তাহার পুরস্কার দিত ; রাজার দিক হইতে সে সম্ভাবনার অভাবে তিনিই সে কাজ করিলেন। মাইকেল-বধ কাব্যে তুমি যে মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছ তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত ছিল তোমাকে পুরস্কৃত করা ; সে সম্ভাবনাও যখন নাই, তখন পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় আমি ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়া তোমাকে পুরস্কার দিব। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, এত বড় আশ্বাস সত্ত্বেও কবির জীবিতকালে ইহা প্রকাশ করা হয় নাই।" ('ভাব ও ছন্দ')

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ তিন বছরে সজনীকান্তের সঙ্গে কবির গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা স্মরণ করে উত্তরকালে সজনীকান্ত লিখেছেন— 'বস্তুত পুনর্মিলনের গোড়ার দিকটায় তাঁহাকে কম উত্ত্যক্ত করি নাই। তিনি হাসিমুখে সমস্ত আবদার শুধু সহ্য করেন নাই, চরিতার্থ করিয়াছেন। ইহার পর, তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওই সম্পর্ক অটুট ছিল। তাঁহার বহু শুভানুধ্যায়ী তাঁহাকে সাবধান ও সতর্ক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাকে যাঁহারা ঘোরতর অপছন্দ করিতেন তাঁহারা মৎসম্পর্কে মান অভিমান ও শাসনের ভয়ও দেখাইয়াছেন। তিনি নিজে সেই সকল গল্প আমাকে শুনাইয়াছেন কিন্তু কখনও বিচলিত হন নাই। তিনি কাহাকেও কাহাকেও এই কালে বলিয়াছিলেন, "সজনী আমার রাবণ-ভক্ত"। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪৯৪)

পত্র-ধৃত প্রসঙ্গ

সজনীকান্ত দাসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

পত্র-১

১ 'গোরা'-র ষষ্ঠ অধ্যায়ের একস্থানে ছিল,— "ক্ষণকালের জন্য রমাপতি চাহিয়া দেখিল, গোরার সুদীর্ঘ দেহ একটা দীর্ঘতর ছায়া ফেলিয়া মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া একাকী ফিরিয়া চলিয়াছে।"

"মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে" ছায়া "দীর্ঘতর" হতে পারে না। একটি সুচিন্তিত পত্রে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে সবিনয়ে তাই নিবেদন করেছিলেন।

সজনীকান্তের এই পত্র বিফলে যায় নি। 'গোরা' উপন্যাসের পরবর্তী সংস্করণে (১৩৩৪, চতুর্থ বিশ্বভারতী সংস্করণ, ২৬ অধ্যায়, পৃ. ২৩৯), রবীন্দ্রনাথ "দীর্ঘতর"র স্থানে "খর্ব্ব" করেছিলেন। ('সংশোধিত এই বাক্যটি অবশ্য সজনীকান্তের উক্তিমতো "ষষ্ঠ অধ্যায়ে"য় নয়, এটি পাওয়া যাবে বর্তমান ২৬ সংখ্যক অধ্যায়ে।'— দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৮৭৮)।

এই প্রসঙ্গে সজনীকান্তের উক্তি বিশেষ উল্লেখ্য— 'এই দীর্ঘতরকে খর্ব করা— ইহাই বাংলা-সাহিত্যে আমার সর্ব প্রথম কীর্তি, আধুনিক ভাষায় "অবদান"ও বলিতে পারি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার জীবনে দীর্ঘতরকে খর্ব করার ইহাই শেষ নয়।' ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৮২)

২ ৪ সেপ্টেম্বর ১৯২১ (১৯ ভাদ্র, ১৩২৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ষষ্টিতম বার্ষিক সংবর্ধনা সভায় যোগদানের অবকাশ পেয়েছিলেন সজনীকান্ত। সেই রাত্রেই রবীন্দ্রনাথকে বন্দনা করে সজনীকান্ত রচনা করেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি কবিতা। যার প্রথম ছত্র—"ওগো আঁধারের রবি"। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৭৮)

পত্র-২

১ ১৩৩৩-৩৪ বঙ্গাব্দে বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত নবীন ও তরুণ সাহিত্যগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছিল। যাঁদের সাহিত্যে আধুনিকতার প্রকাশ পেয়েছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবধারাকে অবলম্বন ক'রে। 'শনিবারের চিঠি' তৎকালীন সেই সব আধুনিক সাহিত্য ও তার স্রষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করে, এবং তাঁদের একান্ত বলভরসা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছেও এই বিষয়ে তাঁদের আর্জি জানিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন —" 'শনিবারের চিঠি' নামে এক সাপ্তাহিক প্রবাসী-পত্রিকার অন্যতম সহকারী-সম্পাদক সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী ও সম্পাদক কল্লোলাদি পত্রিকার রচনার মধ্যে অশ্লীলতাদুষ্ট অংশ চয়ন করিয়া 'মণিমুক্তা' নামে প্রকাশ করিতেন; সাহিত্যে বে-আব্রুতা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইহা তাঁহারা করিতেন সত্য, কিন্তু তাহার ফল হইত বিপরীত— বাংলা কথাসাহিত্যের সকল অশ্লীলাংশ পাঠকরা একস্থানে পাইয়া তাহা সাগ্রহে সম্ভোগ করিত।"

সজনীকান্ত ১৩৩৩ সালে ফাল্গুন মাসে (১৯২৭ মার্চ)— কবির য়ুরোপ সফরের দুই মাসের মধ্যে সাময়িক সাহিত্যের বর্ণনা দিয়া একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠান। কবি তাহার উত্তরে লেখেন (২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩) এই পত্রটি।

এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আরো লিখেছেন— "এই সময়ে কবির মন 'ঋতুরঙ্গশালা'র মধ্যে ডুবিয়া আছে; তাই বোধ হয় বিতর্কমূলক রচনায় মন গেল না।...

মালয় যাত্রার পূর্বে অনুরোধেই হউক বা কর্তব্যবোধেই হউক কবি 'সাহিত্যধর্ম' নামে প্রবন্ধ লিখিলেন।" (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৩ : 'সাহিত্যে দ্বন্দ্ব', পৃ. ৩০৬-০৭)

২ 'বিচিত্রা' ১৩৩৪, শ্রাবণ, ১ম বর্ষ—১ম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৃ. ১৭১-৭৫) রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য-ধর্ম্ম' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব অর্থাৎ সাহিত্যদৃষ্টির স্বরূপ

নির্ণয় করে এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। প্রবন্ধটি প্রকাশের ফলে বঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। এবং তারই ফলস্বরূপ 'বিচিত্রা'র পরবর্তী দুটি সংখ্যায় দুটি প্রবন্ধের আত্মপ্রকাশ হয়। প্রথম প্রবন্ধটি হল 'নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত'র "সাহিত্যধর্ম্মের সীমানা", 'বিচিত্রা' ১৩৩৪ ভাদ্র, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা (পৃ. ৩৮৩-৯০) ও দ্বিতীয় প্রবন্ধটি— 'দ্বিজেন্দ্র-নারায়ণ বাগ্‌চী'র—"'সাহিত্য-ধর্ম্মের সীমানা"— বিচার', 'বিচিত্রা' ১৩৩৪ আশ্বিন, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা (পৃ. ৫৮৭-৬০৬)। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৩ : 'সাহিত্যে দ্বন্দ্ব', পৃ. ৩০৮)

—এ বিষয়ে আরো দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১০২৪-২৭

পত্র-৩

১ রাধারাণী দেবী (১৯০৩-১৯৮৯)। অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে তাঁর রচিত পদ্য প্রথম প্রকাশিত হয় 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায়। তিনি 'রাধারাণী দত্ত' নামে 'ভারতবর্ষ', 'উত্তরা', 'কল্লোল', 'ভারতী', পত্রিকায় লিখতেন।

রায় জলধর সেন বাহাদুর -সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ' ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ, ত্রয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যায় (পৃ. ৯২০-৩৮), রাধারাণী দত্তের 'সাগর স্বপ্ন' নামক একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। তারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করে মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৩৪ কার্তিক সংখ্যায়, 'মণিমুক্তা' বিভাগে কিছু বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এই নিয়ে তাঁর লাঞ্ছনা সাহিত্যের আঙিনা থেকে সামাজিক দেহলিতে গিয়ে পৌঁছয়।

রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বিদ্রূপের বাণী বড়ো কঠিন ভাবে বাজে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন শনিমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে শান্তিনিকেতন থেকে এই পত্রটি প্রেরণ করেন।

[বি. দ্র. এই পত্রটি সম্বন্ধে সজনীকান্ত দাসের পুত্র রঞ্জনকুমার দাসের কাছে বর্তমান সংকলয়িতা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। উত্তরে রঞ্জন দাস

বলেছিলেন যে, 'তাঁরা মনে করেন এই চিঠিটি— রবীন্দ্রনাথ 'শনিবারের চিঠি'র গোষ্ঠীকে লিখেছিলেন।']

পত্র-৪

১ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র উষালগ্নে, শনিগোষ্ঠীর সঙ্গে কল্লোল ও কল্লোল-অনুসারী অন্যান্য পত্রিকার, আধুনিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করে প্রবল বিরোধ বাধে। এই সম্পর্কে সজনীকান্ত লিখেছেন "আমরা কয়েকজন একক (অশোক চট্টোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস, মোহিতলাল মজুমদার ও সজনীকান্ত দাস), 'শনিবারের চিঠি' একা— বিরুদ্ধ পক্ষে বড় বড় মহারথী, একুনে সাতাশটি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র। চারিদিকে 'ত্রাহি ত্রাহি' রব উঠিয়াছিল ; সেকালের অতি আধুনিক ও আধুনিকত্বের সমর্থক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা খুলিলেই ইহার পরিচয় মিলিবে।"

একমাত্র রবীন্দ্রনাথ আমাদের পক্ষে ছিলেন।

(দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ১৯০)

আধুনিক সাহিত্য-সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রার্থনা করে সজনীকান্ত তাঁকে আনুমানিক ১৩৩৪ কার্তিকে একটি পত্র লিখেছিলেন।

৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তরটি জানান।

২ 'প্রবাসী' ২৭শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ (পৃ. ২১৫-২১৯), রবীন্দ্রনাথের 'যাত্রীর ডায়ারি' শিরোনামে 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

পত্র-৫

১ তারানাথ রায় -সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আত্মশক্তি'।

২ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় -সম্পাদিত ১৩৩৪ আষাঢ় মাসিক 'বিচিত্রা', ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যায় (পৃ. ৯-৭০), রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' গীতিনাট্য কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

সজনীকান্ত এই গীতিনাট্যের বিরূপ সমালোচনা করে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এবং তা 'অরসিক রায়' ছদ্মনামে সাপ্তাহিক

'আত্মশক্তি'র ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের ৯, ১৬, ২৩, ৩০ তারিখে ও আশ্বিন মাসের ২৭ তারিখের সংখ্যায় পাঁচ কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

৩ মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)। কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক ও প্রবন্ধকাররূপে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেন। 'শনিবারের চিঠি'র তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। সজনীকান্তের সাহিত্যজীবনের প্রথমদিকে মোহিতলাল মজুমদারের বিশেষ ভূমিকা ছিল। সমালোচনা সাহিত্য ও ব্যঙ্গ সাহিত্য রচনায়, সজনীকান্তকে তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

৪ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর -সম্পাদিত, 'ভারতী' ১২৮৪, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। (দ্র. রবিজীবনী : ১, পৃ. ২৬৩-৬৬)

৫ কবিকৃত বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহের সমালোচনাটি ১৩০০ চৈত্র সংখ্যার সাধনা পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তা 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। (দ্র. রবিজীবনী ৩, পৃ. ২৯১)।

পত্র-৭

১ ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ হিবার্ট লেকচারার মনোনীত হয়েছিলেন। ১৯ মে ১৯৩০, অক্সফোর্ডের ম্যানচেস্টার কলেজে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম হিবার্ট বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতামালার পরবর্তী দুই দিন হল ২১ ও ২৬ মে, ১৯৩০। এই ভাষণের বিষয় ছিল : 'The Religion of Man'। কবির এই বক্তৃতা তৎকালীন ইংলন্ডে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

কিছুকাল পরে এই প্রবন্ধগুলির বক্তব্য 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৩, পৃ. ৩১৬, ৩১৯, ৩৭১-৭৩)

২ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'শনিবারের চিঠি' আধুনিক সাহিত্যকে বিদ্রূপ করে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। 'শনিবারের চিঠি'র পক্ষ থেকে বারংবার সজনীকান্ত পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথকে "সম্পূর্ণ দলাদলি নিরপেক্ষভাবে

চিরন্তন সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ১২৯) করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

১৩৩৪ শ্রাবণ 'বিচিত্রা'র ১ম, বর্ষ ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যায় 'সাহিত্য ধর্ম্ম' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বক্তব্য এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় নি। এই প্রবন্ধ রচনার অব্যবহিত পরেই তিনি পূর্ব এশিয়া অর্থাৎ জাভা, সুমাত্রা, বালি, মালাক্কা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন (যাত্রাকাল : ১২ জুলাই ১৯২৭—২৭ অক্টোবর ১৯২৭)।

২৩ অগস্ট ১৯২৭ জাভা থেকে বালি যাবার পথে প্লানসিউজ জাহাজে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যধর্ম্ম'-এর পরিপূরক 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি ১৩৩৪ অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে 'যাত্রীর ডায়েরি' শিরোনামায় প্রকাশিত হলে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী : ৩, 'সাহিত্যে দ্বন্দ্ব', পৃ. ৩০৪-০৭)।

পত্র-৮

১ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭)। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও জাতীয় অধ্যাপক। তিনি ছিলেন মধ্যবর্তী সেতু। একদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম ভক্তি, অপরদিকে শনিগোষ্ঠীকে তিনি অতিমাত্রায় স্নেহ করতেন। ১৩৩৬ শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি' রবীন্দ্র-বিদূষণে যখন অতিমাত্রায় মুখরিত হয়, সেই আঘাত রবীন্দ্রনাথকে ভীষণভাবে স্পর্শ করে। সুনীতিকুমার এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র হয়ে দরবার করতে। যার ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিও বিরূপ হলেন।

এই চিঠিটি রবীন্দ্রনাথের লেখা সুনীতিকুমারকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু এই সময় কবি এত বেশি রকম বিচলিত ছিলেন যে চিঠিটির একটি নকল সজনীকান্তকে পাঠিয়েছিলেন।

সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে পরবর্তীকালে লিখেছেন যে "রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ক্ষমা না করিলে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না"। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ২৯৪)।

২ বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য সফরকে কেন্দ্র করে সুনীতিকুমার কবিকে পত্রযোগে এই বিষয়ে তাঁর বিরূপ মতামত জানিয়েছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য সফরকে কেন্দ্র করে উভয়পক্ষের মধ্যে যে পত্রাঘাত চলে তার ফলস্বরূপ তাঁদের মধ্যে ঈষৎ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীকালে ১৯৩৮ সালে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা-ভাষা-পরিচয়' গ্রন্থটি সুনীতিকুমারকে উৎসর্গ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের এই অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে, কবি ও সুনীতিকুমারের মধ্যে পুনর্মিলনের সূত্রযোজনা করেছিলেন।

(দ্র. ক) 'আত্মস্মৃতি' পৃ. ৫০২-৫০৩

খ) 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত' পৃ. ১৬৭

গ) রবীন্দ্রনাথের পত্র ১৫ ও ১৬

ঘ) রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সজনীকান্তের পত্র সংখ্যা-৬-এর সূত্র (২) ও (৩)। এবং পত্র সংখ্যা-৭-এর সূত্র (২) ও (৩)।

পত্র-৯

১ ১৩ জুন ১৯৩৮, রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বাংলা কাব্য পরিচয়'-এর প্রথম খণ্ড প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু গ্রন্থটির ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় রবীন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ ও অশান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অচিরাৎ, আর-একটি সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ সংকলন প্রকাশ করবার বাসনা তিনি প্রকাশ করেন।

সংকলনটির সংস্কার ও নব সংস্করণের কাজে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে পঞ্চসদস্যের একটি সহায়ক পরিষদ গঠিত হয়। সজনীকান্ত এই পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। এই নিয়োগপত্রটি তারই সাক্ষ্য।

পত্র-১০

১ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮, ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন আসবেন মেদিনীপুরে, বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে। এই উপলক্ষে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটি প্রশস্তি কবিতা রবীন্দ্রনাথের কাছে

প্রার্থনা করেছিলেন সজনীকান্ত। ৫/৯/১৯৩৮ তারিখে সজনীকান্ত প্রার্থিত লেখাটিকে স্মরণ করে একটি স্মারক পত্র কবিকে প্রেরণ করেছিলেন। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের বিস্মৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র ৩)

২ তৎকালীন মেদিনীপুর জেলা অধিকর্তা বিনয়রঞ্জন সেন, ছিলেন বিদ্যাসাগর স্মৃতি সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছেই উল্লেখিত প্রশস্তি কবিতা পাঠানোর কথা জানিয়েছেন। কবিতাটি স্মৃতিমন্দির প্রবেশ উৎসবের (৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬) আমন্ত্রণপত্রে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়।

বিনয়রঞ্জন সেনকে প্রেরিত স্বস্তিবচন—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরালো প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা-আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা।
হে বিদ্যাসাগর, পূর্বদিগন্তের বনে-উপবনে
নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে মহাক্ষণে*॥

* গ্রন্থে : শুভক্ষণে। অনুষ্ঠানে সজনীকান্ত কবিতাটি পাঠ করেন। (দ্র. 'পল্লী-শ্রী', (শ্যামলকৃষ্ণ দত্ত-সম্পাদিত, মেদিনীপুর) ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৫, পৃ ৬)

৩ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র সুধীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ‘সাধনা’ ১২৯৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় ‘মুক্তির উপায়’ গল্প প্রথম প্রকাশ হয়।

‘মুক্তির উপায়’ গল্পটিকে পরে রবীন্দ্রনাথ নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। (দ্র. ‘রবিজীবনী’ ৩, পৃ. ২০৫)

এই নাটকটি সজনীকান্ত তাঁর সম্পাদিত ‘অলকা’ মাসিক পত্রিকার ১ম, বর্ষ ১ম, সংখ্যার প্রথম লেখা হিসেবে প্রকাশ করার বাসনা নিয়ে কবির কাছে সবিনয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ‘মুক্তির উপায়’ নাটকটি ‘অলকা’ ১ম, বর্ষ ১ম, সংখ্যা আশ্বিন ১৩৪৫-এ (পৃ. ৫৭-৮৮) প্রকাশিত হয়।

৪ সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর (১৮৯৬-১৯৬৯) কবি হিসেবে খ্যাতি ছিল। জীবনের প্রায় ৫০ বছর শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর সেবায় নিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালীন সহচর ও একান্ত সচিব ছিলেন।

সুধাকান্তকে উদ্দেশ করে একাধিক কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তন্মধ্যে ‘প্রহাসিনী’র অন্তর্গত মাত্র দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। (দ্র. প্রহাসিনী ৩, রবীন্দ্র-রচনাবলী ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৪০৭)

পত্র-১১

১ ‘মুক্তির উপায়’ নাটকটি।

২ ‘মুক্তির উপায়’ নাটকটির ভূমিকায় রয়েছে— ‘পুষ্পমালা’ হৈমর দূরসম্পর্কের দিদি। সংস্কৃততে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার ‘একজন গুরু আছেন, তিনি খাঁটি বনস্পতি জাতের।’

রবীন্দ্রনাথ এই নাটকটিকে কোনোভাবেই তাঁর উচ্চস্তরের রচনা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারেন নি। এই মর্মে কবি কিশোরীমোহন সাঁতরাকে ১৭/৯/৩৮ তারিখে একটি চিঠিতে লেখেন—

“নাটকখানা ওকে [সজনীকান্তকে] পাঠিয়ে দিয়েছি। কবে ওদের কাগজ বেরবে জানিনে। জিনিষটা যে শ্রেষ্ঠদরের তা এখনো আমার মনে হয় না। বোধ হয় আমার সেক্রেটারির [সুধাকান্ত রায়চৌধুরী] দ্বিধা আছে —তাই ওটা অভিনয় সম্বন্ধে খুঁৎ খুঁৎ করচে।”

৩ দ্বিতীয় সংস্করণ 'কাব্য-পরিচয়'-এর যে খসড়া তৈরি করেছিলেন পঞ্চ পারিষদ তারই পরিমার্জিত রূপটি দেখতে রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী ছিলেন।

১৭/৯/৩৮ তারিখে কিশোরীমোহন সাঁতরাকে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে লিখেছেন— "কাব্য-পরিচয় সম্বন্ধে সজনীকে তাগিদ কোরো। একবার খসড়াটা আমার কাছে দাখিল কোরো— কারণ যখন আমার নাম থাকবে তখন দায়িত্ব আমার।"

৪ দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০)। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র। প্রখ্যাত কবি, গায়ক, সুরকার ও লেখক। তিনি সঙ্গীতরত্নাকর উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

১৩ জুন ১৯৩৮ তারিখে প্রকাশিত, রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' সংকলনে কবিকৃত নির্বাচিত দিলীপ রায়ের কবিতাগুলি সম্পর্কে স্বয়ং রচয়িতা বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ২৯ জুন ১৯৩৮ কিশোরীমোহন সাঁতরা মংপুতে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লেখেন—"দিলীপ রায় সম্মতি দিয়েছেন; কিন্তু লিখেছেন 'Selection ভাল হয় নি কিন্তু, প্রায় কারুরই নয়'।" (দ্র: 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বাংলা কাব্য পরিচয়' দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৯, পৃ. ২২)

বাংলা কাব্য-পরিচয় প্রথম সংস্করণ প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নানা দিক থেকে নানাবিধ অশান্তি শুরু হয়। ফলস্বরূপ পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণের 'কাব্য-পরিচয়' নির্বাচন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অনেক ক্ষেত্রেই বিরত করেন এবং সেইসব স্থানে পঞ্চসদস্যের পরিষদের সহায়তা গ্রহণ করেন। সজনীকান্ত ছিলেন এই পরিষদের অন্যতম সদস্য কিন্তু তাঁর নামোল্লেখে দিলীপ রায় কিঞ্চিৎ বিচলিত হতে পারেন এই আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ দিলীপ রায়ের নিকট সজনীকান্তের নাম এক্ষেত্রে আর উল্লেখ করেন নি।

পত্র-১২

১ ধীরেন্দ্রনাথ সরকারের আর্থিক উদ্যোগে ও সজনীকান্তের সম্পাদনায় 'অলকা' আত্মপ্রকাশ করে ১৩৪৫ আশ্বিনে।

২ বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। বাংলা আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম কাণ্ডারী। আধুনিক যুগের কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক। 'প্রগতি' ও 'কবিতা' ত্রৈমাসিকের সম্পাদক।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য-পরিচয়' প্রথমবার প্রকাশিত হয় ১৩ জুন ১৯৩৮। (দ্র. 'রবীন্দ্রজীবনী' ৪, পৃ. ১৩৪-৩৫)

'বাংলা কাব্য-পরিচয়'-এর দ্বিতীয় খসড়ায়, রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে আধুনিক কবিদের রচনা সংযোজন করেছিলেন। এই শেষের পরিবর্তিত অংশ নিয়ে 'কাব্য-পরিচয়' পুনর্বার প্রকাশিত হলে, 'কবিতা' ত্রৈমাসিকের সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু, ১৩৪৫ আশ্বিন সংখ্যার 'কবিতা' পত্রিকাতে সংকলনটির বিশেষভাবে সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। (দ্র. 'বাংলা কাব্য-পরিচয় প্রসঙ্গে'— রবীন্দ্রচর্চা, ৩য় সংখ্যা ১৯৯৮)

তাঁর মতে—" 'বাংলা কাব্য-পরিচয়ে'র উদ্দেশ্য অনির্দিষ্ট, নির্বাচনের ভিত্তি অনুপস্থিত ; এমন কি গদ্যছন্দ বর্জন সম্বন্ধে একটিমাত্র উল্লিখিত নীতিরও ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না যে রবীন্দ্রনাথই এই বইয়ের সম্পাদক, হয়তো শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তাঁর কেরানিদের উপর তিনি বড়ো বেশি নির্ভর করেছিলেন।" (দ্র. 'বাংলা কাব্য-পরিচয়'— 'কবিতা' ১৩৪৫ আশ্বিন, সংখ্যা—৭ পৃ. ৫৫-৭৫)।

৩ সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭)। প্রখ্যাত আধুনিক কবি। মূলত গদ্য কবিতার রচয়িতা। পিতা অরুণচন্দ্র সেন, শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে 'বাংলা কাব্য-পরিচয়' প্রকাশকালে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ 'সমর-সেন'-এর রচিত কবিতা সংকলনভুক্ত করেন নি। ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কোনো-কোনো সমালোচক কবি সম্পাদিত সংকলনের বিদ্রূপও করেছিলেন। কিন্তু এই বিদ্রূপ ছিল ভ্রান্তিমূলক। কারণ রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যপরিচয়'-এর ভূমিকায় স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলেন 'যে গদ্য কবিতা এই সংকলনে সম্পূর্ণ বর্জন করা হবে।' ("দ্র: 'বাংলা কাব্য-পরিচয় প্রসঙ্গে'— রবীন্দ্রচর্চা, ৩য় সংখ্যা ১৯১৮)।

'সমর সেন'-এর কবিতা নির্বাচিত না হওয়ায় বুদ্ধদেব বসু অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে লিখলেন—"গদ্য কবিতা রবীন্দ্রনাথ নেন নি ; না নেবার অধিকার তাঁর সম্পূর্ণই আছে। সেইজন্যে সমর সেন বাদ পড়েছেন। ১৯২৭-২৮-এর পরে অর্থাৎ কল্লোলের সময়ের পরে, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে নতুন শক্তির আবির্ভাব সমর সেনেই। খুব কম বাঙালী কবিতেই এত অল্প বয়সে এতখানি বুদ্ধির পরিণতি ও আঙ্গিকের উপর দখল পাওয়া গেছে। বাংলা গদ্যছন্দকে সমর সেন নতুন ক'রে সৃষ্টি করেছেন ও করছেন। তাঁর প্রভাব এর মধ্যেই যথেষ্ট ব্যাপক, আজকের দিনে দেখা যাচ্ছে প্রায় কোনো যুবকই তাঁকে অনুকরণ না ক'রে লিখতে পারেন না। সমর সেনের প্রভাব পাওয়া যায় এমন কবিতা 'বাংলা কাব্য-পরিচয়ে'ও আছে। সমর সেনকে নিতে হবে ব'লেই গদ্যছন্দকে স্বীকার করা অযৌক্তিক হত না, তবে রবীন্দ্রনাথ যখন গদ্য ছন্দকে নেনই নি, তখন ভুলক্রমেও কোনো গদ্যকবিতা যাতে ঢুকে না পড়ে সে বিষয়ে তাঁর লক্ষ্য নিশ্চয়ই প্রখর ছিল। কিন্তু নিশিকান্তর 'পণ্ডিচেরির ঈশান কোণের প্রান্তর' কেমন করে ঢুকলো? (দ্র. 'বাংলা কাব্য-পরিচয়', 'কবিতা', ১৩৪৫ আশ্বিন, সংখ্যা-৭, পৃ. ৭২)

৪ 'কাব্য-পরিচয়'এর নির্বাচন সম্বন্ধে যে দিলীপকুমার রায় দুঃখ পেয়েছিলেন তার ইঙ্গিত মেলে রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটি সুদীর্ঘ পত্র থেকে। 'কাব্য-পরিচয়'-এর সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথকে লেখা দিলীপ রায়ের পত্র থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

"কাব্য সংকলনের মতো কাজ বড় পরিশ্রমের কাজ— বহু নগণ্য লেখকের লেখা ঘেঁটে তবে নির্বাচন করতে হয়। আপনার লক্ষ কাজ —আপনি শ্রান্ত— কাজেই কেউ আপনার কাছে এতটা খাটুনির আশা করে না— কিন্তু যাঁরা নির্বাচন করেছেন তাঁদের bonafides সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করবার হেতু যথেষ্ট। তাঁরা আপনার সুনামকেও নিজের কাজে লাগালেন আর আপনি এতে প্রকাশ্য সম্মতি দিলেন এতেও আপনার বহু অকৃত্রিম ভক্ত ব্যথা পেয়েছেন। তারা হয়ত সবাই নগণ্য কিন্তু তবু তাদের বেদনারও কোনো মূল্য আপনার কাছে নেই— ভাবতে কি জানি

কেন প্রায় সেন্টিমেন্টাল গোছের ব্যথা লাগে। আরো দুঃখ এই যে এ সব কথা প্রকাশ্যে লেখার পথ নেই— যেহেতু অন্যকে লক্ষ্য করে বাণ ফেললেও সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং আপনি— যাঁর কাছে আমাদের ঋণ এত বেশি যে একটু ব্যথা দিতে মন চায় না। ইতি প্রণত দিলীপ।" (দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বাংলা কাব্য-পরিচয়' দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮৯, পৃ. ৩২)

৫ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০১-১৯৬০। বিশিষ্ট আধুনিক কবি। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক। পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'তন্বী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত দুটি কবিতা 'শ্রাবণ বন্যা' ও 'নবীন লেখনী'— এই দুটি কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ নবচেষ্টার পরিচয় হিসেবে কাব্য-পরিচয় সংকলনে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের মতে তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাকে তিনি বর্জন করেছেন। তিনি এই মর্মে ১ জুন ১৯৩৮ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগকে তাঁর অভিযোগ একটি পত্রযোগে ব্যক্ত করেন। চিঠিটি হল—

"সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রমারফৎ জেনে গর্ববোধ করছি যে আমার দুটো কবিতা রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত কাব্যসঙ্কলনে স্থান পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। সে-দুটোর মধ্যে 'শ্রাবণ বন্যা' (যার প্রথম লাইন : সঙ্কীর্ণ দিগন্তচক্র ; অবিলুপ্ত নিকট গগনে) নামক কবিতাটির পুনর্মুদ্রণে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেটার আরম্ভ : অধুনা আনীত নব অলিখিত, সেটা একেবারেই অচল। কারণ আমার লেখার অন্যত্র তার চেয়ে ভালো রচনা তো আছেই, যে বই থেকে ওটা নেওয়া, তাতেও ওটাই নিকৃষ্টতম। সুতরাং ওই কবিতাটি সঙ্কলন থেকে বাদ দিলে অনুগৃহীত হবো। ইতি ১ জুন ১৯৩৮।

বশংবদ

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সম্ভবত এই চিঠির সংবাদ রবীন্দ্রনাথের গোচরে আসে। এবং কালিম্পঙ থেকে ১০ জুন ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথকে পত্রযোগে লেখেন :—

"১০ জুন ১৯৩৮

ওঁ

Gouripur Lodge
Kalimpong
Phone Kal-10

কল্যাণীয়েষু

শুনলুম বাংলা কাব্যপরিচয়ে তোমার কবিতা ছাপানো ব্যাপারে তোমার মন উত্ত্যক্ত হয়েছে। বোধহয় অদ্ভুত শয্যাশরিকদের সান্নিধ্য তোমার ভালো লাগচেনা, বোধ হয় বাছাই কাজও পছন্দমাফিক হয় নি।...

ভাবী সংস্করণে ছাড়া সংশোধনের উপায় নেই তাই এবারকার মতো তোমাদের পরিচয়ে একটা কবিতার দ্বারা ক্ষতের উপর প্রলেপ দেবার চেষ্টা করা গেল। ইতি ১০/৬/৩৮

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

দ্র. চিঠিপত্র, ষোড়শ খণ্ড, পৃ. ৭৩-৭৪

উত্তরে সুধীন্দ্রনাথ ১১ জুন ১৯৩৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্রযোগে তাঁর অভিযোগ পুনরায় জানান। তার কিয়দংশ হল—

"'বাংলা কাব্যপরিচয়'-এর সংশোধন আর সম্ভব নয় জেনে সত্যই মর্ম্মাহত হলুম। কিন্তু এ দুঃখবোধের জন্যে আমার শয্যা-শরিকেরা দায়ী নন।... 'তন্বী' বইখানায় এই রকম খারাপ কবিতা একাধিক আছে। কিন্তু তার মধ্যে সব চেয়ে নিকৃষ্ট নিশ্চয় 'নবীন লেখনী'। তাই সেটার পুনর্মুদ্রণে আমার ঘোরতর আপত্তি।"

তিনি আরো লিখলেন— "আসলে এই সঙ্কলনের সঙ্গে আপনার নাম জড়িত না থাকলে সঙ্কলনকারের দায়িত্বহীনতা উপেক্ষা করা হয়তো শক্ত হতো না। কিন্তু ছাপার হরফে আপনি যার সম্পাদক, এমন বই অনাগত বাঙালী পাঠকেরও শ্রদ্ধা পাবে। তা না পেলেও এ-বই যখন

বিদ্যার্থীদের পাঠ্য, তখন এর সম্বন্ধে এতখানি অসতর্কতা শোচনীয়। এখানে আপনার ভাগ্যে অনুরূপ বিড়ম্বনা ঘটেছে জেনেও কোনো সান্ত্বনা নেই, ...”।

(দ্র. চিঠিপত্র ষোড়শ খণ্ড, পৃ. ১০০-১০২)

রবীন্দ্রনাথ ১৬ জুন ১৯৩৮ কালিম্পঙ থেকে কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লিখছেন— “সুধীন্দ্র যদি তাঁর কবিতা সম্বন্ধেও সেই রকম শুদ্ধি অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁর অভীপ্সিত কোনো কবিতা (যদি ঐ মাপে পাওয়া যায়) তা দিতে পারো। সমসাময়িক কবিদের নিয়ে এর চেয়ে আরো বিভ্রাট ঘটেনি এইই আমার আশ্চর্য ঠেকছে। কবি জাতটাই খুঁৎখুঁতে।”

“সুধীন্দ্রের নালিশের কথাটা বিচার কোরো”। এই মর্মে নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে কবির এই উক্তি বিশেষ উল্লেখ্য।

দ্র. চিঠিপত্র (ষোড়শ খণ্ড, পৃ. ৩৪২)

ভবিষ্যৎ সংস্করণের কাজে পুনরায় যাতে এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না হয় সেই ভেবেই সজনীকান্তকে এই পত্রে কবির সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশ লক্ষণীয়।

পত্র-১৩

১ অক্টোবর, ১৯৩৮-এ রবীন্দ্রনাথের যে কালিম্পঙ যাবার একটা পরিকল্পনা ছিল তা তিনি ২৪/৮/৩৮ তারিখের একটি চিঠিতে ইন্দিরাদেবীকে লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

শান্তিনিকেতন

UTTARAYAN
Santiniketan Bengal

“কল্যাণীয়াসু বিবি

...৩রা সেপ্টেম্বর নাগাদ এখানে বর্ষামঙ্গল হবে—ততদিনে তোরা আসতে পারবি আশা করচি। তারপরে আমি কালিম্পঙ চলে যাব স্থির হয়েছে।...

২৪/৮/৩৮

রবিকাকা”

(দ্র. চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ৭৫, পৃ. ১১৯)

অক্টোবর ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথ কালিম্পঙ যাবার যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। সেই সময়ের দৈনন্দিন কাগজ 'হিন্দু', 'স্টেট্সম্যান' ও 'যুগান্তর'-এর সংবাদ সূত্রে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথ অক্টোবরে (১৯৩৮) শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসেছিলেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার দরুন ও শান্তিনিকেতনের পারিপার্শ্বিক আনুকূল্যের গুণে তিনি আবার শান্তিনিকেতনেই প্রত্যাগমন করেছিলেন।

(সূত্র : শ্রীপ্রশান্তকুমার পালের ব্যক্তিগত সংগ্রহ)

পত্র-১৪

১ কিশোরকান্ত বাগ্‌চী, হেমন্তবালা দেবীর কন্যা বাসন্তী বাগ্‌চী ও ডা. নিখিল বাগ্‌চীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

২ কিশোরকান্তের জন্ম উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ৩০ জুলাই ১৯৩৮ যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন, তা 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা হিসেবে স্থান পায়। যদিও ভ্রমবশত তার রচনা তারিখ '১৯/৮/৩৮' রূপে মুদ্রিত হয়েছে। অবশ্য কাব্যগ্রন্থে দুইটি পঙক্তির স্থান পরিবর্তন ও শেষ পঙ্‌ক্তির 'এই বুঝি দিল আনি' স্থলে "বুঝিবা দিতেছে আনি" পাঠ লক্ষণীয়। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪৯৮-৫০০) সজনীকান্ত উক্ত কবিতাটি 'শনিবারের চিঠি'র জন্য কবি-সমীপে প্রার্থনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 'কবিতাটি' তৎপূর্বেই নরেন্দ্র দেব -সম্পাদিত কিশোর পত্রিকা 'পাঠশালা'য় প্রকাশিত হয়ে যায়।

৩ কিশোরকান্তের ডাকনাম।

৪ হেমন্তবালা দেবী (১৮৯৪-১৯৭৬)। গৌরীপুর, ময়মনসিংহের দানবীর, শিল্পী, সংগীতানুরাগী জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের ভাগ্নে ব্রজেন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরীর সঙ্গে হেমন্তবালার বিবাহ হয়।

তিনি জোনাকী, সত্যবাণী দেবী ছদ্মনামে লিখতেন। জীবনের পরম আধ্যাত্মিক সংকটে তাঁর 'কবিদাদা'র সঙ্গে যে পত্রালাপ শুরু করেন তার সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম।

'চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চরম মতবিরোধের চূড়ান্ত মুহূর্তে যখন শনিচক্রের আক্রমণ, চরম-সীমা লঙ্ঘন করেছে, সেই সময়ে হেমন্তবালা দেবীর মধ্যস্থতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সজনীকান্তের সন্ধিস্থাপনের প্রচেষ্টা, বঙ্গসাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চিরস্মরণীয় ঘটনা।

৫ সজনীকান্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি সদ্য-আবিষ্কৃত পত্র, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর অবগতির জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

৬ 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'র জন্য সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে পত্রযোগে একটি লেখা প্রার্থনা করেছিলেন।

৭ রবীন্দ্রনাথ তার জবাবে লিখেছিলেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত তাঁর 'ভাষা পরিচয়'এর ভূমিকাটি তিনি পরিষদ পত্রিকার জন্য দিতে সম্মত। কিন্তু বইটির স্বত্বাধিকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের।

প্রসঙ্গত "(২৪ অক্টোবর ১৯৩৮, ৭ কার্তিক ১৩৪৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়। গ্রন্থখানি বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ কর্তৃক পাঠ্যরূপে মনোনীত হইয়াছে।"

(দ্র. রবীন্দ্রজীবনী চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৯)

৮ রবীন্দ্রনাথের শর্ত ছিল, সজনীকান্ত যদি তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০১-১৯৫৩), নিকট 'ভাষা-পরিচয়'এর ভূমিকাটি পুনঃপ্রকাশের সম্মতি আদায় করতে পারেন তা হলে তা প্রকাশে আর কোনো বাধা হবে না।

প্রসঙ্গত "বাংলা 'ভাষা-পরিচয়ে'র ভূমিকা" প্রবন্ধাকারে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৯ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন-এর তোষণনীতি। তিনি হিট্‌লারকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে তোষণনীতি দ্বারা সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'কাব্য-পরিচয়'এর নির্বাচনকার্যে আধুনিক যুগের কবিদের শান্ত করতে চেম্বারলেনি পদ্ধতিকে অনুসরণ করার কথাও ভেবেছিলেন।

পত্র-১৫

১ বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস যদিও খুব বেশি পুরোনো নয় তথাপি যে সকল অতীতের গদ্য-গ্রন্থ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি নির্মাণে বিশেষ ভাবে সহায়তা করে। এই অল্পকালের মধ্যেই তাদের অধিকাংশের অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায়। যেমন : ১৭৪৩ সনে প্রকাশিত রোমান অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা গদ্য-গ্রন্থ—'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ' মানু এল্‌-দা-আস্‌সুম্পসাম্‌। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রথম গদ্য-গ্রন্থ, বাংলা হরফে মুদ্রিত, রাম রাম বসু-রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত বহু পরিশ্রম করে এই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করেন ও তাদের যথাযথ পাঠ মিলিয়ে, ভূমিকায় লেখকের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জীসহ গ্রন্থগুলি পুনঃপ্রকাশ করেন। এই প্রকাশিত গ্রন্থগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা বলে অভিহিত হয়।

২৭ অক্টোবর ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত লিখে দিয়েছিলেন। "ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ করিয়া অমর কীর্তি অর্জন করিয়াছেন।"—প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ পৃং ২৫০। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৪, পৃ. ১৫৯)

সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় দুষ্প্রাপ্যগ্রন্থমালার ১২ ও ১৩ সংখ্যক গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার ১২—'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৩৪৬, শ্রাবণ) ও ১৩ 'কথোপকথন' (১৩৪৯, বৈশাখ)।

২ নাতির (কিশোরকান্তের) জবানীতে দিদিমা (হেমন্তবালা দেবী) সম্বোধনী কবিতার উত্তর দিলে রবীন্দ্রনাথের উত্তরটি সজনীকান্তের মারফত প্রেরিত হয়। কিন্তু উক্ত পত্র যথাসময়ে যথাস্থানে না আসায়, হেমন্তবালার নালিশে কবির এই উক্তি।

৩ রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল 'বাংলা ভাষা পরিচয়' তিনি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করবেন। এবং গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বে সুনীতিকুমারকে দিয়ে তা "আগাগোড়া যাচাই" করে নেবেন। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩২৯)

কিন্তু একদিকে 'শনিবারের চিঠি'র হয়ে ওকালতি ও অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যসফরকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে যে পত্রাঘাত চলে তাতে তাঁদের সম্পর্কে অন্তরের গভীরে ছেদ পড়েছিল।

অবশেষে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের এই অভিপ্রায়ের কথা সুনীতিকুমারের কাছে নিবেদন করেন। তিনিও সানন্দে রবীন্দ্রনাথের উভয় বাসনা পূরণ করতে রাজি হন।

(দ্র : ক) সজনীকান্তের লেখা চিঠি, সংখ্যা—৬ ও ৭

খ) রবীন্দ্রনাথের ৮-সংখ্যক পত্রের সূত্র-২)

পত্র-১৬

১ আশ্বিন ১৩৪৫, 'অলকার'র ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' প্রকাশিত হয়েছিল। তার দক্ষিণা রূপে কাঞ্চন মূল্য দেড়শত টাকার একটি চেক পত্রযোগে ৩০/১০/৩৮ তারিখে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র-৬)

২ 'বাংলা ভাষা পরিচয়' সম্পর্কিত কাজে, রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর নির্দেশানুযায়ী 'শনিবার' ৫ নবেম্বর, ১৯৩৮, সস্ত্রীক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী শম্ভু সাহা ও সজনীকান্তের শান্তিনিকেতন যাবার দিন স্থির হয়েছিল।

৩ হেমন্তবালা দেবীর দৌহিত্র কিশোরকান্তের ডাকনাম 'নাচন'। নাচনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানির বাহক ছিলেন সজনীকান্ত।

পত্র-১৭

১ রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' গল্পটিকে অবলম্বন করে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় যে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। তা 'দশচক্র' নামে সর্বপ্রথম ষ্টার থিয়েটারে ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১০-এ অভিনীত হয়। (দ্র. 'সাধারণ রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৪০)

দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'মুক্তির উপায়' গল্পটির নাট্যরূপ লেখেন। এবং তা 'অলকা' ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ১৩৪৫ আশ্বিনে প্রকাশিত হয়।

নাট্যরূপ দেবার দুমাস পরে 'মুক্তির উপায়' নাটকটি মহড়া প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে একটি পত্রে

লিখেছেন—"আশ্রমে 'মুক্তির উপায়' অভিনয়েরও আয়োজন হচ্ছে।" তারিখ ৬ নবেম্বর ১৯৩৮।

কিন্তু ১১ নবেম্বর ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে লিখছেন "রঙ্গমঞ্চে...মুক্তিসাধন ঘটল না। প্রয়োগকুশল নটের অভাব।" (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র ১১ সূত্র ২)

২ জেম্‌স ফেনিমোর কুপার (১৭৮৯-১৮৫১) বিখ্যাত মার্কিন কবি। ভিক্টোরিয়ান যুগের সাহিত্যিক। মার্কিন মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পত্র-১৮

১ সুফিয়া হোসেন (সুফিয়া কামাল বেগম) ১৯১১-১৯৯৯। শৈশবে প্রথাগত শিক্ষালাভের সুযোগ না হলেও পরবর্তী জীবনে বিদ্রোহী করি নজরুলের শিষ্যা ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা, প্রতিবাদি বিশিষ্ট কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে খালাত ভাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে বিবাহ হয়।

১৯২৫-এ 'তরুণ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'সৈনিক বন্ধু' প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭-এ 'কেয়ার কাঁটা' ও ১৯৩৮-এ 'সাঁঝের মায়া' কাব্যগ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়। সম্ভবত পত্রে রবীন্দ্রনাথ 'সাঁঝের মায়া' সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন।

পত্র-১৯

১ হেমলতা দেবী (১৮৭৩-১৯৬৭)। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা হেমলতা দেবীর বিবাহ হয় ২৩ এপ্রিল ১৮৯১। হেমলতা দেবী ছিলেন দ্বিপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। (দ্র. 'রবিজীবনী' ৩, পৃ. ২০৬-০৭)

হেমলতা দেবী ছিলেন সুলেখিকা। তাঁর 'দেহলি' গ্রন্থের গল্পগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ যে পত্রটি লিখেছিলেন, তা 'দেহলি' গ্রন্থের প্রথমে মুদ্রিত হয়। পত্রটি এখানে উদ্ধৃত হল :—

"কল্যাণীয়াসু

তোমার ছোটো গল্পগুলি পড়ে আমার খুব ভালো লাগল। কী মানবচরিত্রের কী তার পারিপার্শ্বিকের চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের ছোটো বড়ো নানা গ্রামে পল্লীতে তুমি ভ্রমণ করেছ, সেই উপলক্ষে তোমার দৃষ্টি শক্তি তোমার অভিজ্ঞতাকে বিচিত্র করে তুলেছে, তোমার গল্পগুলি সেই অভিজ্ঞতার চিত্র প্রদর্শনী। তোমার গল্পগুলির মধ্যে সাহিত্যিক গুণপনা বিশেষভাবে ফুটেছে তাদের সম্বন্ধে আমার এই মন্তব্য। ইতি ৮ই চৈত্র ১৩৪৫"।

দ্র. 'দেহলি' প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৪৬)

তাঁর 'জ্যোতিঃ' কাব্যগ্রন্থে কবিতা ও গান সংকলিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রয়েছে—"শ্রীমতী ইন্দিরী দেবী, পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্বশুর মহাশয়, পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্বশুর মহাশয় ও প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার কয়েকটি গানে সুরসংযোগ ও স্বরলিপি করিয়া দিয়াছেন।..." (দ্র. 'জ্যোতিঃ', (ভূমিকা— গ্রন্থকর্ত্রী)

শান্তিনিকেতনের আশ্রমে বালকগণের কাছে তিনি 'বড়মা' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি পুরীতে বসন্তকুমারী বিধবা আশ্রমে শেষজীবন অতিবাহিত করেন।

পত্র-২০

১ ১৯৩৫ জানুয়ারি, সজনীকান্ত 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদনার কাজে ইস্তফা দেবার পরে, পুরাতন নথিপত্র ও সাময়িক পত্রপত্রিকা নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করেছিলেন। সঙ্গী হিসেবে ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বেনামী রচনাগুলির একটি সুষ্ঠু পঞ্জী তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। তৎকালীন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'ভারতী', 'সাধনা', 'ভাণ্ডার', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকাতে অনেক রচনাই 'নামহীন ও কল্পিত নামাঙ্কিত ছিল। তন্মধ্যে যে-সমস্ত রচনাগুলিকে সজনীকান্ত নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিবলে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে চিহ্নিত করেছিলেন সেই সমস্ত অনুমেয় রচনাগুলির 'সঠিক নির্ধারণ' করবার জন্যে

অক্টোবরের গোড়ার দিকে তিনি রবীন্দ্রনাথকে মংপুতে একটি পত্রযোগে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

২ মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে বিদ্যাসাগর স্মৃতি সৌধের নির্মাণকার্য প্রায় সমাপ্তির পথে। সমিতির কর্তাদের ঐকান্তিক বাসনা উক্ত মন্দিরের দ্বারোদঘাটন যেন রবীন্দ্রনাথ করেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সজনীকান্তের হৃদ্যতার কথা বহির্জগতে গোপন ছিল না। অতএব উক্ত সমিতির কর্তারা এইসূত্রে সজনীকান্তকে কবির কাছে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন।

পত্র-২১

১ আচার্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন ১৮৬২-৬৩ পর্যন্ত। তিনি পুনরায় যুগ্মভাবে অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর সঙ্গে পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন ১৮৭১-৭২। (দ্র. 'রবীন্দ্রজীবনী'-৪, পৃ. ৩২২)

রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র' [?] শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, ১৮৭৩ সালে মে-জুন মাসে অর্থাৎ ১৭৯৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা'র পরবর্তী ছয় সংখ্যা ধরে। সেই সময় দেখা যাচ্ছে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন অযোধ্যানাথ পাকড়াশী। তাঁর সম্পাদনার কাল ১৮৭২-৭৮।

প্রসঙ্গত এই রচনাটি সম্বন্ধে দ্বিমত আছে এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবিষয়ে চিঠিতে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

২ 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম বছরে অর্থাৎ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ সংখ্যায়, পৃ. ২০০-০৬ ; রবীন্দ্রনাথের বাল্য বয়সের রচনা 'ঝান্‌সীর রাণী' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭, মে (১৩৬৪ বঙ্গাব্দে ২৫ বৈশাখ) বিশ্বভারতী এই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। পরে ১৩৬২, ২২ শ্রাবণ প্রকাশিত 'ইতিহাস গ্রন্থে প্রবন্ধটি সংকলিত হয়। (দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', পৃ. ২৩২)

"ঝান্‌সীর রাণী' রচনাটি 'ভ' স্বাক্ষরযুক্ত, যেটি রবীন্দ্রনাথের পরিচয়বাহী। তা ছাড়া মালতী পুঁথি-র 32/১৭ খ পৃষ্ঠায় 'ঝান্সী রাণী'

শিরোনামে একটি গদ্য রচনা পাওয়া যায়, যার সঙ্গে ভারতী-তে প্রকাশিত প্রবন্ধটির মধ্যবর্তী অনেক অংশের বিষয় ও ভাষায় সাদৃশ্য আছে। 'মালতী পুঁথি'-তে প্রবন্ধটির সম্পূর্ণ খসড়া সম্ভবত করা হয়নি।" (দ্র. 'রবিজীবনী'-১, পৃ. ২৭৬-৭৭)

৩ রবীন্দ্রনাথের 'সান্ত্বনা' প্রবন্ধটি 'ভারতী' ১২৮৪, চৈত্র সংখ্যায় পৃ. ৩৯৯-৪০১ প্রকাশিত হয়।

বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ত্রিংশ খণ্ডে 'বিবিধ' বিভাগে 'সান্ত্বনা' অন্তর্ভুক্ত হয়, (ফাল্গুন ১৪০৪), পৃ. ৩৮৭-৮৮।

পত্র-২২

১ ১৭ অক্টোবর ১৯৩৯ সজনীকান্ত মংপুতে রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি চিঠিতে কবির জ্যোতিষবিষয়ক লেখা সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানান। সঙ্গে হেমন্তবালা দেবীর একটি লেখাও পাঠিয়েছিলেন। (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৩৪)

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—এই চিঠির "সঙ্গে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হেমন্তবালা দেবীর একটি লেখাও প্রেরিত হল।" (দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ১৭৩)

কিন্তু ঐ সময়কার 'শনিবারের চিঠি'তে হেমন্তবালা দেবীর কোনো লেখা প্রকাশিত হয়নি। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'তে পৃ. ৪৯৬-৯৭, জোনাকী দেবী ছদ্মনামে হেমন্তবালা দেবীর রচিত 'গদ্যকবিতা' শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়।

পত্র-২৩

১ ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ তৃতীয়বার রবীন্দ্রনাথ মংপুতে গিয়েছিলেন। (দ্র. 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ১০১)

রবীন্দ্রনাথ ২৫/১০/৩৯ তারিখে ইন্দিরাদেবীকে মংপু থেকে একটি পত্রে লেখেন—

"—৫ই নবেম্বর অবতরণ করব নিম্নভূমিতে। দু-চার দিন কলকাতায় যখন থাকবো দেখা হবে।...

রবিকাকা

কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, লিখেছেন, এই যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্যে প্রায় দুইমাস ছিলেন। সময়কাল— ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে ৯ নবেম্বর ১৯৩৯। ও কলকাতায় দুইদিন বাসের পর ১১ নবেম্বর ১৯৩৯, কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়েছিলেন। (দ্র. 'রবীন্দ্রজীবনী'-৪, পৃ. ২০৪)

পত্র-২৪

১ ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ ভারতী চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় পৃ. ৫৯-৬০ 'শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচায্য' ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথের 'দুদিন' কবিতা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে কবিতাটি সন্ধ্যাসঙ্গীত ১/৩২-৩৩ সংকলিত হয়। (দ্র. রবিজীবনী ২, পৃ. ৬৭)

'দুদিন' কবিতাটির পূর্বকথনে শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন— রবীন্দ্রনাথ প্রথম বার বিলাত থেকে বিদায়কালে "ডাঃ স্কটের বাড়িতেও এক শোকাবহ দৃশ্যের অবতারণা হল।" 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ, মিসেস স্কট্ ও তাঁর মধ্যে বিদায় সম্ভাষণের কথা উল্লেখ করলেও, স্কট কন্যাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। কিন্তু কবির প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত স্বরূপ মালতীপুঁথির 61/৩২ ক ও 62/৩২ খ পৃষ্ঠায় একটি অসম্পূর্ণ কবিতা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন—"যেটি এই বিদায় অবলম্বনে লেখা। ...বোঝা যায় অব্যবহিত বেদনার অভিঘাতে কবিতাটির সমগ্র ভাবরূপ মনের মধ্যে স্পষ্ট হওয়ার আগেই তিনি এটি লিখতে শুরু করেছিলেন।

...পরে কবিতাটি ভারতীর জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ [পৃ. ৫৯-৬০] সংখ্যায় আরও অনেকগুলি ছত্র ও পাঠান্তরসহ 'শ্রীদিকশূন্য ভট্টাচার্য্য' স্বাক্ষরে 'দুদিন' নামে মুদ্রিত হয়। ভারতী-তে সাধারণত রচয়িতার নাম মুদ্রিত হত না, তা-সত্ত্বেও 'শ্রীদিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য্য' নাম ব্যবহার কিছু তাৎপর্য বহন করে বলে মনে হয়—গভীর হৃদয়বেদনাকে লঘু করে দেখানোর প্রয়াস এতে সুস্পষ্ট।" (দ্র. 'রবিজীবনী-২', পৃ. ৪৫)

২ 'সমালোচনী' পত্রিকাতে, রবীন্দ্রনাথের 'শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর' ও 'শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর। অমরাবতী' ছদ্মনামে রচিত দুটি কবিতা ও চারটি

প্রবন্ধ প'ওয়া যায়, রচনাগুলি হল—

১৩০৮, ১ম বর্ষ, ১ম, ২য় সংখ্যা, মাঘ, ফাল্গুন, পৃ. ৮১-৮২। 'শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর। অমরাবতী', ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, কবিতাটির নাম 'আদর্শ কবিতা'।

১৩০৯, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ২০৫-২১৪, 'রণরঙ্গিনী' 'আদর্শ উপসংহার *'। ("শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত * 'ফুলজানি' উপন্যাসের উপসংহার")। রচয়িতা 'শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর।'

১৩০৯, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র, পৃ. ৩০৪-০৬, একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নাম 'সম্পাদকের প্রতি'। রচয়িতার নাম ছিল 'শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর।' অমরাবতী'।

১৩০৯, ১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ, পৃ. ৪৭৩-৭৬, 'অনুস্বর ও বিসর্গ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকারের নাম 'শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর।'

১৩১০, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, পৃ. ২১-২৪, 'প্রস্তাব' শীর্ষক পত্রাকারে রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকারের নাম— 'শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর।'

১৩১১, ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃ ২২১-২৬, 'সমালোচনার ধারা' —পত্র-প্রবন্ধ— 'শ্রীঅপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর।'

পত্র-২৫

১ ২১ নভেম্বর ১৯৩৯, সজনীকান্তের জীবনে একটি স্মরণীয় সন্ধে —ঐদিন শান্তিনিকেতনে কবিসকাশে উপস্থিত হয়েছিলেন সজনীকান্ত, তাঁর সদ্য আবিষ্কৃত, কবির বালক বয়সের রচিত "অভিলাষ" কবিতা নিয়ে।

ঐদিন কবির রচিত কবিতা ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত আরও অন্যান্য সামগ্রীও, সজনীকান্ত কবির কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৩৬)

২১ নভেম্বর সন্ধেতে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়ে সজনীকান্তকে একটি কৌতুক রেখাচিত্র স্বহস্তে এঁকে দান করেছিলেন। চিত্রটিতে কবির মন্তব্য ছিল—"সাহিত্যে অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি"। চিত্রটির সঙ্গে "অবচেতনার

অবদান" শীর্ষক একটি ছড়াও রচনা করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ছড়াটির প্রথম ছত্র—

"গল্‌দা চিংড়ি তিংড়ি-মিংড়ি"। এই ছড়াটির সঙ্গে একটি মুখবন্ধ যুক্ত ছিল। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-২৫)

প্রসঙ্গত কৌতুক চিত্রসহ ছড়াটি 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কবিতাটির রচনাকাল বিষয়ে একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। " 'ছড়া' বইটির প্রথম প্রকাশকাল থেকে এখনও পর্যন্ত— এর শেষতম মুদ্রণ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫) পর্যন্ত কবিতাটির তারিখ দেওয়া আছে '১৯ নভেম্বর ১৯৪০'। বিভিন্ন রচনাবলীতে (বর্তমান রচনাবলীতেও) ওই একই তারিখ মুদ্রিত আছে। কিন্তু কবিতাটির তারিখ ১৯ নভেম্বর ১৯৩৯। পাণ্ডুলিপিতে এই তারিখই দেখা যায়।" (দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৪৭৪)

পত্র-২৬

১ রচনাবলী সংস্করণের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ "প্রাক্ সন্ধ্যাসঙ্গীত যুগের" রচনাগুলিকে আমল দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন।

কিন্তু সজনীকান্তের মতে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাই রচনাবলীভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সজনীকান্ত এই মর্মে কবির বাল্য ও কৈশোরের রচনাগুলিকে রচনাবলীভুক্ত করবার অভিপ্রায় জানিয়ে তাঁর অনুমতির জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে আবেদন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জোর গলায় বলেছিলেন—"সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি ইতিহাসের ধারা মানিনে।" 'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন— "কবি শেষ পর্যন্ত অনেক অনুনয়-বিনয়-ধস্তাধস্তির পর "অচলিত সংগ্রহ" আখ্যা দিয়া "রচনাবলী"র কয়েকটি খণ্ড প্রকাশে অনুমতি দিলেন।" (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৩৭)

'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথের ঝড়তি-পড়তি লেখা সংগ্রহ ও প্রকাশে তাঁহার যে আপত্তি ছিল না" উল্লেখিত দলিলটি তারই সাক্ষ্য। (দ্র. রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' বৈশাখ ১৩৬৭-৬৮)

পত্র-২৭

১ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯, মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানের জন্যে রচিত ভাষণ।

প্রসঙ্গত 'শনিবারের চিঠি' ১৩৪৬ পৌষ সংখ্যায় পৃ. ৪৩৬-৪০ রবীন্দ্রনাথের পঠিত অভিভাষণটি প্রকাশিত হয়। অভিভাষণটির রচনাকাল—২৮/১১/৩৯

২ বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরের দ্বারোদঘাটন উপলক্ষে শান্তিনিকেতন থেকে রেলপথে মেদিনীপুর যাওয়ার পথে হাওড়া স্টেশনে গাড়ি বদলের কথা।

৩ রচনাবলী সম্পাদক মণ্ডলীর বৈঠকে সজনীকান্ত প্রস্তাব করেছিলেন —যে-সকল গ্রন্থে প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছিল, রচনাবলী মুদ্রণকালে তাদের পাঠান্তরগুলিও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া প্রয়োজন। শান্তিনিকেতনে ২১ নবেম্বর ১৯৩৯, সাক্ষাৎকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে সজনীকান্ত তাঁর প্রস্তাবটি নিবেদন করেন। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত ২৩ নভেম্বর ১৯৩৯ পত্রযোগে তৎকালীন রচনাবলী সম্পাদকমণ্ডলীর অধিনায়ক পুলিনবিহারী সেনকে জানান। পত্রটি এখানে উদ্ধৃত হল :—

"কল্যাণীয়েষু,

সজনীকান্তের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করেছি যে রাজা ও রাণী ও বিসর্জনের পাঠান্তরগুলি দ্বিতীয় খণ্ডেরই পরিশিষ্ট ভাগে প্রকাশ করা কর্তব্য— নইলে তার উপযোগিতা ব্যর্থ হবে। ইতি ২৩/১১/৩৯

রবীন্দ্রনাথ"

(দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৩৮)

বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের এই মত অনুসরণ করতে সক্ষম হননি। তাঁদের প্রধান অন্তরায় ছিল রচনাবলী প্রকাশে বিলম্বের সম্ভাবনা। সজনীকান্ত এই বিষয়ে সকলরকম সমস্যার কথা অবহিত করে পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র-১৩)

৪ লোকেন্দ্রনাথ পালিত (১৮৬৫-১৯১৫)। ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিতের পুত্র।

রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—“লোকেন পালিত ছিলেন কবির আবাল্য বন্ধু। প্রথমবার বিলাতে তাঁহার সহিত যে পরিচয় হয় তা লোকেনের অকাল-মৃত্যুকাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ছিল। তিনি ছিলেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভক্ত ও সমঝদার। ১৮৮৬ সালে তিনি সিবিল সার্ভিস পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন।” (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী-১, পৃ. ২১৪-১৭)

বোম্বাই থেকে রবীন্দ্রনাথ ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ সালে প্রথম বার বিলাত অভিমুখে যাত্রা করেন। (দ্র. রবিজীবনী-২ পৃ. ১৪)

‘সাধনা’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে যে বিতর্কের ঝড় লোকেন্দ্রনাথ তুলেছিলেন তাতে তাঁর চিন্তার ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও লোকেন্দ্রনাথের পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধগুলি ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সজনীকান্ত ২৯ নবেম্বর ১৯৩৯ রবীন্দ্রনাথের কাছে পত্র যোগে জানতে চেয়েছিলেন—““মানসী’র ভূমিকায় ‘শেষ উপহার’ কবিতাটি যে ইংরেজি কবিতার ইঙ্গিতে রচিত, তার রচয়িতা কে?। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র-১৩)

রবীন্দ্রনাথের উত্তর ছিল লোকেন পালিত। কিন্তু মূল কবিতাটির সন্ধান পাওয়া যায় নি।

পত্র-২৮

‘বঙ্কিম রচনাবলী’ (বঙ্কিম জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) সম্বন্ধে দু-এক ছত্র লিখে দেবার জন্যে, ২৯ নবেম্বর ১৯৩৯ তারিখে সজনীকান্ত পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। রচনাবলী প্রচারের সুবিধার্থে কবির অভিমতটি ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় এবং সেইসঙ্গে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ করবার অভিপ্রায়, কবির কাছে জানিয়েছিলেন সজনীকান্ত। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র-১৩)

১ ডিসেম্বর ১৯৩৯, তারিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিমতটি লিখে পাঠিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঝাড়গ্রাম রাজকুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরের সহায়তায় ও তৎকালীন মেদিনীপুর জেলা অধিকর্তা বিনয়রঞ্জন সেনের উদ্যোগে এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে ১৩৪৫ আষাঢ় মাসে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মশতবার্ষিক দিবসে 'বঙ্কিম রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। 'বঙ্কিম রচনাবলী' ইংরেজি ও বাংলা রচনায় সম্পূর্ণ হয় নয় খণ্ডে ১৩৪৮ সালের পৌষে।

পত্র-২৯

১ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯ কলকাতা পৌরসভা -আয়োজিত 'খাদ্য ও পুষ্টি' প্রদর্শনার (Food and Nutrition Exhibition) উন্মোচন অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। স্থির হয়েছিল শান্তিনিকেতন থেকে ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছবার পর, মেদিনীপুরগামী ট্রেন ছাড়বার মধ্যবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করবেন।

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৩৯, শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণ কৃপালনি, অনিলকুমার চন্দ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও শচী রায়। প্রদর্শনীর পক্ষ থেকে কবিকে স্টেশনে স্বাগত জানান তৎকালীন কলকাতার মেয়র নিশীথ সেন, কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার।

রবীন্দ্রনাথ উৎসব ক্ষেত্রে "খাদ্য ও পুষ্টি" সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র ভাষণ পাঠ করেন। এবং 'খাদ্য ও পুষ্টি', কলিকাতা পৌর পরিষদের অনুষ্ঠিত, খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কীয় প্রদর্শনীতে পঠিত।" প্রবাসী, ১৩৪৬ পৌষ সংখ্যায় পৃ. ৪১৮-১৯ প্রকাশিত হয়। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী-৪, পৃ. ২০৯)

রচনাটির শেষ অনুচ্ছেদের আগে আরো একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ পাওয়ায় যায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র (১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯) প্রতিবেদনে :

"গত মহাযুদ্ধের পর যে ক্ষোভ আমি প্রকাশ করেছিলাম আজ তার পুনরুক্তি সময়োচিত হবে। আমি বলেছিলাম আমাদের দেশে সামরিক অবরোধ নেই, কিন্তু চিরদৈন্যের অবরোধে দেশের

অধিকাংশ লোকই যে বহুকাল ধরে আধপেটা খেয়ে আসছে তার উত্তরোত্তর সঞ্চিত পরিমাণের কথা ভালো করে ভাবি নি। আমরা যতটা খাই তাতে না হয় মরণ, না হয় বাঁচন। কেননা, শুধু কেবল নিশ্বাস নেওয়াকেই তো বাঁচা বলে না। শিশুর মৃত্যুসংখ্যা আমাদের দেশে খুবই বেশি, কিন্তু যে শিশু মরে না সে যে চিরজীবন সম্পূর্ণ পরিমাণে বেঁচে থাকবার মতো আহার পায় না সেইটেই দুঃখ। কেবলমাত্র আর্থিক দিক হতে যদি এর ফল দেখি, তা হলে দেখা যাবে আমাদের দেশে মজ্জায় কর্মোদ্যম দুর্বল হওয়াতে অধিক মূল্যে অল্প ফল পাই। অন্য দেশে একজন যে কাজ করে, আমাদের দেশে সে কাজে হয়তো চার জনের দরকার হয়। এতে কেবল কাজের পরিমাণ হ্রাস হয় তা নয়, কাজের গুণও নষ্ট হয়। কেননা, কাজের শক্তি থাকলে সে শক্তি খাটাতে আনন্দ পাই, কাজে ফাঁকি দিতে সহজেই ইচ্ছা হয় না। কর্মসম্বন্ধে সেই সত্যপরতাই কাজের নৈতিক গুণ। য়ুরোপীয় মনিব প্রায়ই অভিযোগ করেন যে আমাদের দেশের লোক কাজে শৈথিল্য করে, তাদের কেবলই পাহারা এবং শাসনের উপর রাখতে হয়। বংশানুক্রমে প্রভুদের নিজেদের দেহ সহজেই পুষ্ট বলে এ কথা তারা মনেই করতে পারে না যে এ দেশে কর্তব্য এড়াবার ইচ্ছার উৎপত্তি প্রধানতই শরীর পোষণের অভাব হতে। দেশের লোক ম্যালেরিয়ায় মরছে এবং জীবন্মৃত হয়ে আছে তারও কারণ ওই, শুধু বেচারা মশাকে দোষ দিলে চলবে না। কী করে আমরা বাঁচব এ কথা ভাববার নয়, কেননা, কোনোমতে বাঁচার চেয়ে মরা ভালো। কী করে আমরা পুরোপুরি বাঁচব সেইটেই ভাববার কথা। কৃশতাবশত জীবনধারণে আমাদের সম্পূর্ণ গা নেই বলে জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা গড়িমসি করে ফাঁকি দিচ্ছি, কর্মসাধনায় সত্যপর হচ্ছি না। এতে সমস্ত দেশের বাহ্যিক ও আন্তরিক যে লোকসান হচ্ছে, সবশুদ্ধ জড়িয়ে যে কম কাজ হচ্ছে, কম ফসল ফলছে, কম বিঘ্ন কাটছে, প্রাণের স্রোতোবেগে মন্থরতা ঘটছে, অঙ্ক দিয়ে কি তার পরিমাণ পাওয়া যায়! শরীর মনের উপজাত যে

অবসাদ, যে ভীরুতা, ঔদাসীন্য, জড়ত্ব আমাদের ধূলিসাৎ করে রেখেছে তার ভার কি সামান্য।"

এ-বিষয়ে আরো তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫ক, ফাল্গুন ১৪০৬, পৃ. ১০১২-১৩।

২ চিরপ্রভা সেন, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী, তৎকালীন মেদিনীপুর জেলা অধিকর্তা বিনয়রঞ্জন সেনের সহধর্মিণী।

সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, মেদিনীপুরে সম্পূর্ণ কবির ইচ্ছাধীনে, স্বতন্ত্র একটি বাড়িতে তাঁকে রাখার ব্যবস্থা করা হবে। এদিকে সুষ্ঠুভাবে সকল ব্যবস্থাদির তদারকি করতে তাঁর একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পূর্বেই মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন। তিনিই রবীন্দ্রনাথকে সংবাদ দিলেন যে তৎকালীন জেলা-অধিকর্তার বাড়িতে তাঁর স্ত্রীর (চিরপ্রভা সেন) তত্ত্বাবধানে কবির থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদে অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে চিরপ্রভা সেনকে ৪ ডিসেম্বর ১৯৩৯, চিঠিতে লিখলেন—

"কল্যাণীয়াসু চির,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুশি হলুম। কিছুদিন থেকেই মেদিনীপুরে যাবার আলোচনা চলছে। তোমাদের দূত সজনীকান্তের সঙ্গে এই কথা স্থির করেছি যে আমাকে একলা কোনো বাড়িতে যেন রেখে দেওয়া হয় —আমার অভ্যেস সম্পূর্ণ নিরালায় থাকা— এখানেও আমি একখানা বাড়িতে একলা থাকি। সজনী তাই বলেছিলেন— আমাকে স্বতন্ত্র বাড়িতে স্থান দেবেন, তাতে আমার অনেকটা ক্লান্তি দূর হবে। ইতি

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪/১২/৩৯"

(দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৩৯-৪০)

এক্ষেত্রে চিরপ্রভা সেনকে চিঠি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিরস্ত হলেন না। সেইসঙ্গে সজনীকান্তকেও ৬/১২/৩৯ তারিখে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

৩ '১৭৯৮ শকের মাঘ মাসের (৯ম কল্প, ২ ভাগ, ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৮২-৮৩ পৃষ্ঠায় একটি

ছোটো অনুবাদ-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে; অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের বলিয়া মনে হয়।" (দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য', পৃ. ২১২)

রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের নামী-বেনামী রচনাগুলি আবিষ্কারের গবেষক সজনীকান্ত ৫/১২/১৯৩৯ তারিখে পত্রযোগে এই সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানতে চেয়েছিলেন। (দ্র. সজনীকান্তের চিঠি, সংখ্যা-১৪)

রবীন্দ্রনাথ ৬/১২/১৯৩৯ তারিখের পত্রে সজনীকান্তকে নিশ্চিত সাক্ষ্য দিতে পারেননি। তবে ভাষাটা যে তাঁর সেকেলে ভাষার মতো, তা তিনি অস্বীকার করেন নি; তিনি লেখেন, "সেকালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ঠিক এই জাতীয় 'কবিতা লিখিয়ে' আর কেহ ছিল না।"

এই অনুবাদটি সম্পর্কে শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন—"তারকা-কুসুমচয় ছড়ায়ে আকাশময়"—প্রথম পঙ্‌ক্তিযুক্ত ৮ ছত্রের এই অনুবাদ কবিতাটি 'রূপান্তর' [১৩৭২] গ্রন্থের পরিশিষ্ট ২-তে 'রবীন্দ্রনাথ-কৃত রূপান্তর বলিয়া অনুমিত' মন্তব্য সহ মুদ্রিত হয়েছে [পৃ. ১৯২-৯৩]। এখানে পঙ্‌ক্তিগুলি অন্যভাবে বিন্যস্ত হওয়ার জন্য কাব্যরূপটি অনেক বেশি স্পষ্ট।" (দ্র. রবিজীবনী-১, পৃ. ২৪৭)

পত্র-৩০

১ নাতনি অর্থাৎ নন্দিনী দেবী (১৯২১-১৯৯৫)। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর পালিতা কন্যা, ডাক নাম পুষু ও পুপে। নন্দিনী দেবী স্মৃতি থেকে লিখেছেন: "শুনেছি আমার বয়স যখন দশমাস সেই সময় আমার বাবা-মা আমাকে রথীন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।...

যতদূর মনে পড়ে ১৯২২ সালে আমি কবিগুরুর পরিবারভুক্ত হই।" (দ্র. রবিজীবনী-৮, পৃ. ২৭৪-৭৫)

নন্দিনী দেবীর পিতা ছিলেন কচ্ছদেশীয় বণিক। নাম— চতুর্ভূজ দামোদর। ১৯২১ সালে সপরিবারে তাঁরা শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে আসেন। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী-৪, পৃ. ২১৩)

১৯৩৯, ৩০ ডিসেম্বর (১৪ পৌষ ১৩৪৬) বম্বের অধুনা মুম্বই-এর অজিত সিং মোরারজী খাটাউ-এর সঙ্গে নন্দিনী দেবীর বিপুল সমারোহে বিবাহ হয়েছিল।

২ রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাক্রমে ১৯৩৮ থেকে সজনীকান্ত রবীন্দ্র-রচনাবলী পরিদর্শন মণ্ডলীর সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। বছরব্যাপী সেই সমস্ত রচনাবলী সংক্রান্ত কাজ অব্যাহত ছিল। সেইজন্যে সজনীকান্তের ডাক পড়েছিল বানানের মন্ত্রণাসভায়।

৩ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য : ১৮৮৩-১৯৬১। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। ১৯৩২-১৯৫৭ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সম্পাদক ছিলেন। রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে তাঁর ইংরেজি রচনাগুলি রচনাবলীতে যেন স্থান পায়। সেই প্রসঙ্গে তিনি এই চিঠিতে সজনীকান্তকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যে ম্যাকমিলানের স্বত্ত্ববহির্ভূত ইংরেজি রচনাগুলিকে রচনাবলী সংস্করণের সময় অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র-১৫)

কিন্তু এই ক্ষেত্রেও তাঁর ইচ্ছা ফলবতী করতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ অক্ষম হয়েছিলেন।

৪ ১৯৩৯-এর শেষার্ধে অমলাদেবী ছদ্মনামে, বাঁকুড়া খ্রীশ্চান কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ললিতানন্দ গুপ্তের 'মনোরমা' নামে গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়। সজনীকান্ত, তাঁর বাল্যবন্ধুর গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর অভিমত জানতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মন্তব্যটি এই পত্রটির সঙ্গে প্রেরণ করেন।

উল্লেখ্য কবির অভিমতটি ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের মাঘের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩৫৫)

পত্র-৩১

১ লর্ড ক্রস (Lord Richard Asseton Cross)-এর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে Indian Council's Bill-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে উপলক্ষ করে কলকাতায় ২৬শে এপ্রিল ১৮৯০ (১৪ বৈশাখ, ১২৯৭), তিনটি প্রতিবাদ সভা আহূত হয়। একটি সভা হয় 'দক্ষিণ শহরতলির চেতলা হাটে ও অপর দুটি আয়োজিত হয় উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রীটের দুটি রঙ্গমঞ্চে। বিডন স্ট্রীটের একটি সভার সভাপতি ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সেন।

অপর সভাটি হয় এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে। উক্ত সভায় পঠিত রবীন্দ্রনাথের 'মন্ত্রি অভিষেক' প্রবন্ধটি ১২৯৭ সালের বৈশাখে 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৯৭ জ্যৈষ্ঠে প্রবন্ধটি ২৪ পৃষ্ঠায় একটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। (দ্র. রবিজীবনী ৩, পৃ. ১৪৩-৪৪)

১৩৪৬ সালের পৌষ মাসে প্রবন্ধটি তখনকার সময়োপযোগী হবে মনে করে, সজনীকান্ত তা 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত করবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি চিঠি লেখেন।

রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে অনুমতি পত্রটি লেখেন ৫ জানুয়ারি ১৯৪০।

'মন্ত্রি অভিষেক' প্রবন্ধটি কবির অনুমতি পত্র সহ ১৩৪৬ মাঘের 'শনিবারের চিঠি'তে ১২শ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় পৃ. ৪৭৫-৯৫ প্রকাশিত হয়।

এ-বিষয়ে আরো দ্রষ্টব্য প.ব. সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৬ (২৫ বৈশাখ ১৪০৮) পৃ. ১১৭৯-৮০।

পত্র-৩২

১ ১৯৪০, জানুয়ারি, সেই সময় বিশ্বভারতীর আর্থিক পরিস্থিতি শোচনীয় রূপ নিয়েছিল। কোনো দিক থেকে সহায়তা না পেলে পরিস্থিতির সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ে অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন বিশ্বভারতীর বেতনভোগী— পরিস্থিতি এমনই সঙ্গিন যে তাঁর বেতনের অর্থ-যোগানও বড়ো কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমতাবস্থায় ১০ জানুয়ারি, ১৯৪০ সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনে কবি-সমীপে উপস্থিত হলে— রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই দুই বিষয়েই সচেতন করেন। ও ব্যঙ্গচ্ছলে বলেছিলেন— "যদি যোগাযোগ ঘটাতে পার তোমাকে যে 'অবচেতনার অবদান' ছবিটি এঁকে দিয়েছি তার ওপর একটি কবিতা লিখে দেব।" (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৪৪)

কলকাতায় সজনীকান্ত দুই বিষয়েই যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। পূর্বকথামতন বিশ্বভারতীর তহবিলে অর্থের জন্য ঝাড়গ্রাম রাজকুমার

নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরের নিকট দরবার করেছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ঝাড়গ্রাম রাজকে ঝাড়গ্রামে বীরসিংহ ও মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা ব্যাপারে অতিরিক্ত দোহন করা হয়েছিল। তাছাড়া তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ'কে 'বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ' প্রকাশার্থ সদ্য সদ্য দশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। এই সব কারণে, সেই সময় ঝাড়গ্রাম-রাজের আনুগত্য পাওয়া সম্ভব হয়নি বিশ্বভারতীর পক্ষে।

২ অমিয় চক্রবর্তী : ১৯০১-১৯৮৬। দেশে ও বিদেশের ইংরেজি সাহিত্যে ও তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক। তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিব রূপে ছিলেন ১৯২৬-৩০ সাল পর্যন্ত। ১৯৩০-এ রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ যাত্রাকালে ও ১৯৩২-এ পারস্য-ভ্রমণের সময়, তিনি কবির ভ্রমণসঙ্গী হয়েছিলেন।

বিশ্বভারতীর এই আর্থিক সংকটকালে (১৯৪০), সজনীকান্ত ঝাড়গ্রাম-রাজের আনুগত্য লাভে সফল না হলেও দ্বিতীয় বিষয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অমিয় চক্রবর্তীকে বহাল করবার জন্য সজনীকান্ত দরবার করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট। যদিও তিনি নানা কারণে অমিয় চক্রবর্তীর ওপর বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না তথাপি রবীন্দ্রনাথের দোহাই দিয়ে তাঁর সম্মতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন সজনীকান্ত। এই প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর দরখাস্তটি যেন ৩১ জানুয়ারি ১৯৪০ তারিখের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছয় এই অনুরোধ জানিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ১৮/১/৪০ তারিখে একটি চিঠি লেখেন। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র-১৬)

৩ "তদাহং নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়"।—কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের কারণে বিপর্যস্ত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা জানবার জন্য দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। শেষপর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্র জয়ের কোনো আশা না থাকায় সঞ্জয়কে এই কথা বলেছিলেন। বিশ্বভারতীর এই সংকটকালে রবীন্দ্রনাথ এতই বিপর্যস্ত ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, কোনো দিক থেকেই তিনি কোনোরকম আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলেন না। সেইজন্যই এই উক্তি করেছিলেন।

পত্র-৩৩

১ *পুলিনবিহারী সেন (১৯০৮-১৯৮৪)। খ্যাতনামা রবীন্দ্রবিশারদ্।* ১৩৩৫ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর কর্মজীবন শুরু। ১৯৩৯ থেকে তিনি বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে যোগদান করেছিলেন। বিস্মৃতপ্রায় রবীন্দ্ররচনার সূচী ও সংকলন, তাঁর জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদান।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম প্রধান, কিশোরীমোহন সাঁতরা অসুস্থ হওয়ায় তাঁরই স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন পুলিনবিহারী সেন। পত্রে "আগামী রবিবার"—অর্থাৎ ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ পুলিনবিহারী সেন শান্তিনিকেতনে আসবেন রচনাবলীকে উপলক্ষ করে। 'ঐ আলোচনা ক্ষেত্রে' সজনীকান্তের উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথের কাছে একান্ত প্রয়োজন। সেই সুবাদে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে জরুরি তলব করে ১/২/১৯৪০ তারিখে, বৃহস্পতিবার সজনীকান্তকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন— চিঠি প্রাপ্তির পরের দিনই অর্থাৎ ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ শনিবার সজনীকান্ত কবি সকাশে উপস্থিত হয়েছিলেন। (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩৫৬)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর ৩/২/৪০ তারিখের চিঠিটি অন্যরূপ সাক্ষ্য দেয়। পত্রসূত্রে জানা যায় যে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০, বেলা ১২টায় তাঁর শান্তিনিকেতনে যাওয়ার দিন স্থির হয়। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র-১৮)

পত্র-৩৪

১ মার্চ ১৯৪০ অর্থাৎ ১৩৪৬-এর ফাল্গুনের গোড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অবসর গ্রহণ করবেন। ফাল্গুনের তৃতীয় সপ্তাহে কার্যনির্বাহক সমিতির কর্মাধ্যক্ষ-নিয়োগ-সভায় নতুন সভাপতির নাম প্রস্তাব করার প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ কখনও পরিষদের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন নি। পরিষদের সূত্রপাতের সময় থেকে পরবর্তী কয়েক বছর সহকারী সভাপতি ছিলেন (দ্র. ক) রবীন্দ্রজীবনী-২, পৃ. ২০১ ; ৪, পৃ. ৩১৯, খ) রবিজীবনী-৪, পৃ. ১৪-১৫, ২৬১-৬২, ৬ পৃ. ৩৯-৪০)

রবীন্দ্রনাথের শারীরিক পরিস্থিতির জন্য সভাপতি রূপে তাঁকে পাওয়া তখন অসম্ভব জেনেও, পত্রযোগে সজনীকান্ত কবিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে প্রস্তাবটি জানিয়েছিলেন। এই চিঠিতে কবি তারই উত্তর দিয়েছেন।

২ ১৯৪০ সালে চণ্ডীদাসকে নিয়ে সেই সময় বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০, সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনে কবিসকাশে উপস্থিত হলে—ওই দিন সেখানে বাঁকুড়া জেলার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে বাঁকুড়া জেলার সাহিত্য সম্মিলনী সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন। তৎকালীন বাঁকুড়া জেলা অধিকর্তা ও বর্ধমানের অস্থায়ী কমিশনার ছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপক হীরালাল হালদারের পুত্র, সুধীন্দ্রকুমার হালদার (আই.সি.এস.)। তাঁর স্ত্রী, কলকাতায় বিখ্যাত চিকিৎসক প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের কন্যা, উষা দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্নেহাস্পদা। এই হালদার দম্পতিই ছিলেন বাঁকুড়ার সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান উদ্যোগী। এবং এঁদেরই আগ্রহাতিশয্যে রবীন্দ্রনাথ ওই বয়সে বাঁকুড়ায় সাহিত্য-সভায় যোগদানে সম্মত হয়েছিলেন।

'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন :— "ইঁহাদের প্রার্থনা শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধ সম্পৃক্ত ছিল। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম এই সভার মূল উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের সাহায্যে বাঁকুড়ায় চণ্ডীদাসকে প্রতিষ্ঠিত করা।" (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৪৫-৪৬)

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"বীরভৌমিক সজনীকান্ত অনুমান করলেন, বাঁকুড়ায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গিয়ে ছাতনাপন্থীরা তাঁর সমর্থন আদায়ের চক্রান্ত করেছেন। সজনীকান্ত অন্তরঙ্গ অবসরে এ বিষয়ে কবিকে সচেতন করিয়ে দিলেন।" তারই ইঙ্গিত রয়েছে 'চাণ্ডীদাসিক চক্রবাত্যা'র মধ্যে। (দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ১৯১)

৩ ৪ মার্চ, ১৯৪০।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "বাঁকুড়ায় কবি ছিলেন হিল্‌হাউস নামে একটি বাড়িতে (১-৩ মার্চ ১৯৪০ : ১৭-১৯ ফাল্গুন

১৩৪৬)।... তিন দিন বাঁকুড়ায় থাকিয়া বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথে কলিকাতা হইয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন।" (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী-৪, পৃ. ২১৯-২২০)

পত্র-৩৫

১ এই বছরে (১৯৪০), বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থা খুবই সঙ্গিন। এই সংকটকালে, অবস্থার সামাল দেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ নানা দিকে সাহায্যের জন্যে অনুরোধ করেছেন। তন্মধ্যে সংগীত ভবনের ভগ্নপ্রায় অবস্থা কবিকে আরও বিচলিত ও উদ্‌বিগ্ন করেছে।

২ ঝাড়গ্রাম রাজ কুমারনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর, বাংলা দেশের বহু হিতকর কাজে ও বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে, তাঁর দানের হাত সুপ্রসারিত করেছিলেন। বিশ্বভারতীর এই সংকট মুহূর্তে, তাই কবির মন বারংবার তার সংস্রব লাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

৩ পূর্বে উল্লিখিত (পত্র ৩২) 'অবচেতনের অবদান' চিত্র বিষয়ে কবিতা বিষয়ে আশ্বাস। অপিচ পরবর্তী পত্র ৩৬ দ্রষ্টব্য।

পত্র-৩৬

১ 'অবচেতনার অবদান' শীর্ষক কৌতুক চিত্রের ওপর রবীন্দ্রনাথ একটি ছড়া রচনা করে সজনীকান্তকে দেবেন বলে প্রতিশ্রুত ছিলেন। যদিও তা ছিল শর্তসাপেক্ষ। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-৩০)

শান্তিনিকেতনের অসহ্য গরম থেকে নিষ্কৃতি পেতে রবীন্দ্রনাথ ২০ এপ্রিল ১৯৪০ কলকাতা থেকে কালিম্পঙ যাত্রা করেন।

কিন্তু রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবীর কালিম্পঙে পৌঁছতে নির্ধারিত সময়ের কিছু বিলম্ব হওয়ায়, রবীন্দ্রনাথ কবি অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্যে মংপুতে এসেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন—"১৯৪০ এর ২১শে এপ্রিল কবি চতুর্থবার মংপু পৌঁছলেন।" (দ্র. মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ১৪৫)

মংপুতে এই যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ সতেরো দিন ছিলেন। এবং ৭ মে ১৯৪০ কালিম্পঙের 'গৌরীপুর ভবন' এ এসেছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী-৪, পৃ. ২৩১-৩২)

অপেক্ষাকৃত শীতল পরিবেশে পাহাড়ে কবির মন যথেষ্ট নরম হয়েছিল বলেই সজনীকান্তের অনুমান। সেই সময়ে প্রসন্নচিত্তে রবীন্দ্রনাথ পূর্বেকার শর্তকে উপেক্ষা করে সজনীকান্তকে পত্রযোগে একটি ছড়া উপহার দিয়েছিলেন। ছড়াটির প্রথম ছত্র—

"সুবলদাদা আনল টেনে আদম দীঘির পাড়ে"।

অর্ধেক শর্ত অপূর্ণ থাকায় কবির এই উপহারে অতিমাত্রায় লজ্জা ও কুণ্ঠা বোধ করেন সজনীকান্ত এবং রথীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় কবিতাটি অপ্রকাশিত থাকে।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর ১৩৪৮ সালের ভাদ্র-সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'তে প্রথম কবিতা হিসেবে কবির হাতের লেখার প্রতিলিপিতে ছড়াটি প্রকাশিত হয়।

"'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত কবিতাটি ছিল লেখাটির আদিরূপে। 'ছড়া' গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতার সঙ্গে প্রভেদ এখানে বেশ কিছু। সেগুলি এখানে দেওয়া হল—'হাঁচির পরে সারি সারি' থেকে পাখার মতো নড়ে' পর্যন্ত চারটি ছত্র সেখানে ছিল না। এ ছাড়াও ছিল না 'টেবিলেতে তুফান ওঠে' থেকে 'সমুখটা যায় পিছে' পর্যন্ত দশটি ছত্র। কিছু ছোটো খাটো প্রভেদ লক্ষণীয়—'বাঁদরওয়ালা বাঁদরটাকে' ছিল—'মনিব মিঞা বাঁদরটাকে' ; 'রামছাগলের ভারী গলায়', ছিল 'রামছাগলের মোটা গলায়' ; 'অল্প কিছু লাগ্‌ল ধোঁকা'— 'অল্প কিছু লাগল ধাঁধা' ; 'বললে, পড়াশুনোয় কেবল' —'বললে, ফিজিক্স পড়ে কেবল' ; 'সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে' ছিল 'সিন্ধুপারে মৃত্যুদূতের'। এ ছাড়া শেষ দুটি ছত্রের পরিবতন অনেকটাই। পাণ্ডুলিপিতে এ দুই ছত্র ছিল :

ছেলেরা সব হাততালি দেয় বাজে রে ডুগডুগি
গভীর জলে কাৎলা খেলায়, জল ওঠে বুগ্‌বুগি॥"

(দ্র. রবীন্দ্র-রচনাবলী ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, ১৪০৮, ২৫ বৈশাখ, পৃ. ৪৭০)

২ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—১৮৯৪-১৯৬১। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক। সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ 'সুর ও

সঙ্গতি' শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত হয়। অপিচ 'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ১৯৪০ 'পরিচয়' পত্রিকার, নবম বর্ষ, দ্বিতীয় ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের—"রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির তীব্র-প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী কালিম্পঙ থেকে "রবীন্দ্র-সাহিত্যের অবসান" নামক একটি রচনা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশার্থ সজনীকান্তের নিকট পাঠিয়েছিলেন। রচনাটি ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠের 'শনিবারের চিঠি'র প্রসঙ্গ কথায় প্রকাশিত হয়।

পত্র-৩৮

১ বোরিক অ্যাণ্ড ডিউয়ির 'টুয়েলভ টিস্যু রেমেডিজ' শীর্ষক বইটি বায়োকেমিক চিকিৎসার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই।

২ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)—১৮৯৯-১৯৭৯)। প্রখ্যাত সাহিত্যিক। ১৯১৫ সালে তাঁর কবিতা 'মালঞ্চ' পত্রিকায় 'বনফুল' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়।

পেশায় ডাক্তার ও দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে ভাগলপুরে তিনি প্যাথলজিস্ট রূপে কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসকে একসময় বড়বাবু, মেজবাবু ও ছোটবাবু বলা হত— এই নামকরণের মধ্যে থেকেই বোঝা যায় তাঁদের আত্মিক হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের গভীরতা কীরূপ ছিল।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায় 'বনফুল' আক্ষরিক অর্থে অনুজ সজনীকান্তের কাছে সকল বিষয়েই ভীষণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। এককথায় সজনীকান্ত ছিলেন তাঁর পারিবারিক বন্ধু, অভিভাবক ও পরামর্শদাতা।

পত্র-৩৯

১ সজনীকান্তের ২৮/৬/৪০ তারিখে লেখা চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের জবাবী চিঠির আনুমানিক তারিখ ২০/৬/৪০ আছে। (দ্র. সজনীকান্তের পত্র-২১)

'আত্মস্মৃতি' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত' এই দুটি গ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথের লেখা এই চিঠির উল্লেখিত আনুমানিক তারিখ ২০/৬/৪০ রয়েছে।

কিন্তু দুটি চিঠির বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করলে রবীন্দ্রনাথের পত্রটির আনুমানিক তারিখ হয় ২৯ জুন ১৯৪০।

এছাড়াও এই প্রসঙ্গে আরও একটি সংগত কারণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ চিঠিটি লেখেন কালিম্পঙ থেকে এইবারে কবি ৩০ জুন ১৯৪০ কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। অতএব চিঠিটি ২৯ জুন তারিখে লিখিত হয়েছে এই আমাদের অনুমান।

পত্র-৪০

১ সজনীকান্তের বিশিষ্ট বন্ধু 'বীরেন মিত্র' বায়োকেমিক চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর ইংরেজিতে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পত্রযোগে একটি প্রশংসাপত্র সংগ্রহের দাবি জানিয়েছিলেন সজনীকান্ত।

২ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

৩ রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসাধীনে থেকে সজনীকান্ত বায়োকেমিক চিকিৎসায় অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত কবির নির্দেশে বোরিক অ্যাণ্ড ডিউয়ির, 'টুয়েলভ টিস্যু রেমেডিজ' গ্রন্থটি তিনি কিনেছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের চিঠি সংখ্যা-২৯)

তদুপরি আরও দুই শত টাকা ব্যয়ে, বায়োকেমিক শাস্ত্র আয়ত্ত করতে অন্যান্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেন সজনীকান্ত। পারিবারিক ক্ষেত্রে এই বিদ্যা প্রয়োগে বিশেষ সুফল পেয়েছিলেন তিনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা উমারানীর সান্নিপাতিক জ্বরের চিকিৎসা তিনি নিজেই বায়োকেমিক মতানুসারে করেছিলেন। চিঠিতে সেই সুখস্মৃতিকেই স্মরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

পত্র-৪১

১ সেপ্টেম্বর ১৯৪০, সজনীকান্তের দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথমটি হাসির কাব্য গ্রন্থ 'কেড্‌স ও স্যান্ডাল' ও অপরটি হাসির গল্পের

বই 'কলিকাল'। সদ্য প্রকাশিত বই দুখানি সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। কবির অভিমত জানার অভিপ্রায়ে।

২ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ "অক্টোবরের আরম্ভে পাহাড়ে পালাবার" কথা লিখেছিলেন। কিন্তু বিকল দেহ ও মানসিক চঞ্চলতার কারণে কোনো ভাবেই আর কলকাতায় থাকতে না পেরে, সেপ্টেম্বরেই তিনি পর্বতাভিমুখে যাত্রা করেন।

শান্তিনিকেতনে সকলের বাধা অগ্রাহ্য করে রবীন্দ্রনাথ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় আসেন। সেখানে ডা. নীলরতন সরকার ও ডা. বিধানচন্দ্র রায় কবিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করেন। এবং রবীন্দ্রনাথের শারীরিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাঁরা তাঁকে পাহাড় অভিমুখে যাত্রা করতে নিষেধ করেন। কিন্তু ডাক্তারদের সকল নিষেধ উপেক্ষা করে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪০, বৃহস্পতিবার রাত্রেই, সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথ কালিম্পঙ রওনা হয়েছিলেন। এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ নিদারুণ অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে সেখান থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। (দ্র. ক. রবীন্দ্রজীবনী ৪, পৃ. ২৪৯-২৫২ ; খ. মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১৮৭-২০০।)

পত্র-৪২

১ বৈশাখ, ১৩৪৮ 'গল্পসল্প' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। (দ্র. রবীন্দ্রজীবনী ৪, পৃ. ২৬৯-৭১)

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—গল্পসল্প, "প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই একখণ্ড সজনীকান্তের কাছে পাঠিয়ে কবি তাঁর মতামত চাইলেন। 'গল্পসল্প' সজনীকান্তের খুব ভাল লেগেছিল। দেশে তিনি একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন।" (দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ২১৬)

সজনীকান্ত একটি পত্রযোগে কবিকে তাঁর এই গ্রন্থটি ভালোলাগার কথা জানান। রবীন্দ্রনাথ পত্রোত্তরে ২৮/৫/৪১ তারিখে এই চিঠিটি লেখেন।

পত্র-৪৩

১ সজনীকান্ত আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথের পত্র [২৮/৫/৪১] পাইয়াই আমি কেন জানিনা, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। ...খবর পাইতেছিলাম, তিনি দিনে দিনে শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন। শেষ পর্যন্ত থাকিতে পারিলাম না।" (দ্র. ক. রবীন্দ্রনাথের পত্র-৪২, খ. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৫৭)

ডায়াবেটিসের প্রকোপে তখন শয্যাশায়ী অবস্থা সজনীকান্তের। বাড়ির বাইরে যাওয়া তখন ডাক্তারের নিষেধ। এমতাবস্থায় স্ত্রী সুধারানীকে চন্দননগরে যাচ্ছেন বলে ৩ জুন ১৯৪১ সকালের ট্রেনে, রবীন্দ্র-দর্শনকামী দুইজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে, ঐদিনই বিকেলের ট্রেনে ফিরে এসেছিলেন।

ভঙ্গুর স্বাস্থ্য নিয়ে সজনীকান্তের অপ্রত্যাশিত আগমনে রবীন্দ্রনাথ খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। কীভাবে আদর আপ্যায়ন করবেন তাই নিয়ে সচিব ও অনুচরদের বিপন্ন করে তুলেছিলেন।

প্রবল অসুস্থতার মধ্যেও সজনীকান্ত যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এইজন্যে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি আনন্দিত ও আহ্লাদিত হয়েছিলেন তার সাক্ষ্য মেলে কবির লেখা পরের দিনের চিঠি থেকে।

সজনীকান্ত এই চিঠি প্রসঙ্গে তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথের, "সম্ভবত বাইরের লোককে লেখা এইটিই শেষ পত্র।" (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৫৭)

২ মাড়োয়ারী বন্ধুর একজনের নাম নেমী চাঁদ। সজনীকান্তের খুব অন্তরঙ্গ ও হিতৈষী বন্ধু ছিলেন।

সুধারানী দাসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

পত্র-১

১ সুধারানীর চিঠির প্রেক্ষাপটে সজনীকান্তের উক্তিটি বিশেষ উল্লেখ্য —বৈশাখ, ১৩৪১, "দীর্ঘ সাত বৎসর বিরতির পর প্রেক্ষাগৃহে প্রথম ঘণ্টা পড়িল"। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪২৬)

বস্তুত ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠের শেষার্ধে হেমন্তবালা দেবী সজনীকান্তকে পত্রদূত করে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ভক্তকে গুরুর সন্নিকটে উপস্থাপন করা।

ইতিমধ্যে, ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে রামমোহন-তিরোভাবের শতবার্ষিক উপলক্ষে বর্ষকালব্যাপী রামমোহন স্মরণোৎসবের সূত্রপাত হয়েছিল। 'শনিবারের চিঠি' ও 'বঙ্গশ্রী' থেকে রামমোহন স্মরণে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু, "অপরাধ হইয়াছিল? সম্পূর্ণ অপক্ষপাতিত্বের অছিলায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে রামমোহন দূষণ হইয়াছিল"। ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪২৪)। ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ সমোড়ক 'শনিবারের চিঠি' ও 'বঙ্গশ্রী' "রিফিউজড্" লিখে ফেরত পাঠালেন। এই প্রসঙ্গে সজনীকান্ত লিখেছেন "ফলে প্রায় বিগলিত বরফ আবার শক্ত হইয়া গেলেন।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৪২৫)।

১৩৪০, পূজাবকাশের প্রাক্কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত 'গদ্য-ছন্দ' প্রবন্ধ-বক্তৃতাটি সজনীকান্ত ১৩৪১ বৈশাখের 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশ করতে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষের একটি শর্ত ছিল; প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন চাই। যথাসময়ে অনুমতি প্রার্থনা করে সজনীকান্ত কবির কাছে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু বৈশাখের তিন তারিখেও অনুমোদন পত্র না পৌঁছনোয় গুদামজাত মুদ্রিত 'বঙ্গশ্রী' নিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন সজনীকান্ত। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পত্র এল ৪ বৈশাখ ১৩৪১।

কিন্তু এইবারের বরফ গলিয়ে ছিলেন সজনীকান্তের সহধর্মিণী সুধারানী। ১৩৪১, নববর্ষে সুধারানী রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। যতদূর সম্ভব 'মাসীমা'— হেমন্তবালাদেবীর অনুপ্রেরণায়। ৩ বৈশাখ, ১৩৪১ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই উত্তরটি আসে।

উমারানী দাসকে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের অটোগ্রাফ-কবিতা

অটোগ্রাফ-কবিতা-১

১ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'উৎসর্গ'; ১২ সংখ্যক কবিতা

২ দ্র. 'স্ফুলিঙ্গ', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ৩, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পৃ. ১১৬২

প্রসঙ্গ কথা-২

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সজনীকান্ত দাসের পত্র

পত্র-১

১৩৩৪ ভাদ্র নবপর্যায়ে মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র ১ম সংখ্যায় প্রথম রচনা (পৃ. ১-৯), সজনীকান্ত দাসের রচিত 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে সজনীকান্ত বাংলা ভাষায় আধুনিকতার যে জোয়ার এসেছিল তারই বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে সংকলিত হয় তাঁর রবীন্দ্রনাথকে লেখা এই চিঠিটি ও তৎসহ কবির জবাবী চিঠি। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-২)

পরবর্তীকালে গৌতম ভট্টাচার্য তাঁর 'শ্লীলতা-অশ্লীলতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পুনরায় প্রকাশ করেন।

প্রসঙ্গত এই পত্রটি বিশ্বভারতীর অভিলেখাগারের সংগ্রহে না থাকায়, ১৩৩৪ ভাদ্র 'শনিবারের চিঠি' থেকে গৃহীত হয়েছে।

১ (দ্র. ক.) সজনীকান্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র সংখ্যক-২, সূত্র (১) এবং (২)।

খ. রবীন্দ্রনাথের পত্র সংখ্যা-৪, সূত্র-(১)।

২ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'শনিবারের চিঠি' বিচ্ছিন্নভাবে তিনটি বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৫ জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত হয় 'জুবিলি সংখ্যা।'— হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে। আষাঢ়ে প্রকাশিত হয় 'বিরহ সংখ্যা'— সমকালীন সাহিত্যকে বিদ্রূপ করে। এবং কার্তিকে 'ভোট সংখ্যা' নির্বাচনকে কেন্দ্র করে।

বিরহ সংখ্যায় (পৃ. ৩৩-৩৫) যোগানন্দ দাস 'শ্রীআলিঙ্গন হাতী' ছদ্মনামে লিখেছিলেন "স্পষ্টকবি" শীর্ষক একটি কবিতা।

ঐ সংখ্যাতে (পৃ. ১১-৩৩) সজনীকান্তের 'শ্রীকেবলরাম গাজনদার" ছদ্মনামে একটি নাটিকা—"Orion বা কালপুরুষ" প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই নাটিকাটি তাঁর 'মধু ও হুল' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

বিরহ সংখ্যাতে (পৃ. ৪৯-৬৪), অশোক চট্টোপাধ্যায় 'শুভগ্রহ' ছদ্মনামে লিখেছিলেন একটি দুই অঙ্কের নাটক "স্বর্গে Sensation !" এবং

'শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল' ছদ্মনামে 'বিরহ্-বেদনা-বিশ্লেষণ' শীর্ষক একটি কবিতা।

সজনীকান্ত ও অশোক চট্টোপাধ্যায়ের উক্ত তিনটি রচনাই বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন —"শনিবারের চিঠিতে পরবর্তীকালে 'অত্যাধুনিক' সাহিত্য নিয়ে যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বান ডেকেছিল এই রচনাত্রয়ে তারই প্রথম কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে।" (দ্র. 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', পৃ. ৩৮-৪১)

পত্র-২

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত ৫-সংখ্যক পত্রের সূত্র-১

২ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত ৫-সংখ্যক পত্রের সূত্র-২

৩ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২)। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন বেশ-কিছুদিন। আবহাওয়া-তত্ত্বের উপর তাঁর গবেষণা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সংখ্যাতত্ত্বের গবেষণায় তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী।

১৯২১-৩১ এই দশবছর তিনি রবীন্দ্রনাথের কর্মসচিব ছিলেন।

১৩৩৪ ভাদ্র ও আশ্বিনের 'সাপ্তাহিক আত্মশক্তি'তে অরসিক রায় ছদ্মনামে সজনীকান্তের রচিত 'নটরাজ' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে, তৎকালীন সমাজে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারিত হয়।

'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন—"অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে 'শনিবারের চিঠি'র আন্দোলন তরুণদের সমর্থক রবীন্দ্র-পরিবেশভুক্ত কয়েকজন প্রধানকে আমাদের প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন দুই অধ্যাপক—অপূর্বকুমার চন্দ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এই দলে ছিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র অপরাধে রবীন্দ্রপৃষ্ঠপোষিত সদ্য-প্রকাশিত 'বিচিত্রা'র প্রতি পুরাতন 'প্রবাসী'তে ঈর্ষাদুষ্ট প্রমাণ করিবার চেষ্টাও গোপনে গোপনে চলিয়াছিল, অরসিক রায়ের 'নটরাজ' প্রবন্ধটিকে তাঁহারা প্রমাণস্বরূপ দাখিল করিতে চেষ্টা করিলেন।" ('আত্মস্মৃতি', প. ২১৬)

অবশেষে "প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ পর পর দুদিন—১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২৫ পৌষ ও ২৬ পৌষ—সজনীকান্তকে ধরে বিশ্বভারতী আপিসে নিয়ে গেলেন।" (দ্র.—'নিপাতনে সিদ্ধ', পৃ. ৩১)

উল্লেখিত দিনের তারিখ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই। কারণ প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সজনীকান্ত যে ঐতিহাসিক পত্রটি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন তার তারিখ ছিল, ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭ বাংলায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ ২৭ অগ্রহায়ণ।

পর পর দুদিন ১১/১২/১৯২৭ ও ১২/১২/১৯২৭ প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে গভীর আলোচনার মাধ্যমে সজনীকান্ত জানতে পারলেন যে তিনি কাজটি ভাল করেন নি ও রবীন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি লিখেছেন : "নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলাম আমার অসাবধানে-ফেলা জল অনেক নীচ পর্যন্ত গড়াইয়াছে। আমি সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া সরাসরি রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হওয়াই সমীচীন সাব্যস্ত করিলাম। সোজাসুজি সামনে যাইবার সাহস হইল না, একখানি দীর্ঘ পত্রযোগে আমার বক্তব্য নিবেদন করিলাম।" (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ২১৭)

পত্র-৩

চিঠির উপরাংশে বাঁদিকে লিখিত রয়েছে "গুরুদেবের কবিতা পাঠানো হোলো ৬/৯/৩৮।" (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১০)

১ বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের দিবস উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের লেখা যে স্বস্তিবচনটি সর্বাগ্রে পঠিত হবে বলে স্থির হয়েছিল। সেই সূত্রে এই স্মারক পত্রটি সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন।

প্রসঙ্গত দীর্ঘ দশ বছর পাঁচ মাস পরে সজনীকান্ত ৫/৯/৩৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে এই পত্রটি লেখেন।

২ স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার (কে. সি. এস. আই) ১৮৭৬-১৯৪৫। তিনি কলকাতা ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ করেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী —ব্যারিস্টার ও অর্থবান। 'ভারতীয় কোম্পানী আইন' ও 'ভারতীয় বীমা আইন'-এর প্রবর্তক।

পত্র-৪

পত্রের মাথার উপরে বাঁদিকে লেখা রয়েছে—"গুরুদেব উত্তর দিয়েছেন ১৫/৯/৩৮।" (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১১)।

পত্র-৫

চিঠির উপরে বাঁ কোণে লেখা আছে "গুরুদেব উত্তর দিয়েছেন ২৮/৯/৩৮"। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১২)

১ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত ১১-সংখ্যক চিঠির সূত্র-৩

২ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত ১২-সংখ্যক চিঠির সূত্র-২

পত্র-৬

চিঠির উপরে বাঁদিকের কোণে লেখা আছে "গুরুদেব উত্তর দিয়েছেন ৩১/১০/৩৮"। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১৬)

১ রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

২ সস্ত্রীক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী শম্ভু সাহা ও সজনীকান্ত।

৩ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত ১৬-সংখ্যক পত্রের সূত্র-২

পত্র-৭

মূল চিঠিটির নিম্নাংশে লাল কালি দিয়ে বড়ো করে "R" অক্ষরটি লেখা আছে।

১ ৩১/১০/৩৮ তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নাচনের চিঠিটির যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছানো সংবাদ জানতে চেয়েছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১৬)

তারই উত্তরে সজনীকান্ত কবিকে পত্রযোগে লিখেছিলেন যে নাচনের চিঠির একটি নকল হেমন্তবালা দেবীর কাছে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন। এবং কবির লেখা আসল চিঠিটি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশার্থে নিজের কাছে তিনি রেখেছিলেন।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রশস্তি কবিতা, নাচনচন্দ্রের জবাব ও পরে কবির নিজের জবাব, সমগ্র রচনাটিকে একটি প্রবন্ধাকারে গ্রথিত করে, তার নাম দিয়েছিলেন—"অতি আধুনিক ভাষা"। প্রবন্ধটি ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি লক্ষণীয় ; কবি লিখেছেন—

"আমার কাছে নাচনের চিঠি এসেছিল সজনীর দৌত্যে—উত্তর গেছে তাঁরই হাত দিয়ে—দূত যদি সে চিঠি লোপ করেন তবে সে নালিশ তোমরা মিটিয়ো—শনিবারের চিঠিতে ওটা বের হবে ভাবিনি—মনে করেছিলুম ওটা অলকায় বেরবে।" (দ্র. চিঠিপত্র নবম খণ্ড, পত্রসংখ্যা ২৪৬, পৃ. ৩৭৯)

২ আত্মস্মৃতিতে সজনীকান্ত লিখেছেন—"৫ই নবেম্বর শনিবার প্রাতঃকালের ট্রেনে আমরা বোলপুরে পৌঁছিলাম"। (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫০৪)

এই সূত্রে বলা যেতে পারে যে তাঁরা ভোরের ট্রেনে রওনা হয়ে বেলা বারোটায় শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছেছিলেন।

৩ সস্ত্রীক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু সাহা ও সজনীকান্ত।

৪ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৫ নন্দলাল বসু : ১৮৮২-১৯৬৬। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী। ১৯১৪ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে চিত্রশিক্ষার অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন।

পত্র-৮

পত্রের উপরে লাল কালিতে "file" শব্দটি লেখা আছে। ও ডানদিকে মাথার উপরাংশে লেখা আছে "গুরুদেব উত্তর দিয়েছেন ১১/১১/৩৮"। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১৭)

১ নবেম্বরের গোড়াতে সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথকে অসুস্থ অবস্থায় দেখেছিলেন। ফিরে এসে এই চিঠিটি লেখেন।

২ কিশোরীমোহন সাঁতরা ১৮৯৩-১৯৪০। তৎকালীন বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক ছিলেন।

৩ কাব্য-পরিচয়ে 'রবীন্দ্রোত্তর যুগে'র কবিদের কবিতা সংকলন সম্বন্ধে সজনীকান্ত নিজেও খুব বেশি মাত্রায় শঙ্কিত ছিলেন। কারণ তিনি স্বয়ং এই দলভুক্ত। সেই কারণে সমস্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য এই যুগের খসড়াটির ওপর প্রয়োজন কবির 'ঢ্যাঁড়া সই'-এর।

প্রসঙ্গত কাব্য-পরিচয়ের আদি ও মধ্য-যুগের নির্বাচন কার্য সমাধানের পথে জেনেও রবীন্দ্রনাথের উদ্‌বেগ ও অশান্তির পরিধি ছিল না। নানা দিক থেকে তরুণ কবির দলের—বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ, অনুরোধ ও নির্দেশে তাঁর অশান্তির মাত্রা ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘন করে। ১১ নভেম্বর ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে লিখলেন "কাব্য পরিচয়ের আদ্য ও মাধ্যদের শ্রাদ্ধ সমাধা হয়ে গেছে—সুতরাং তাঁরা অশান্তি ঘটাবেন না। অন্ত্যরা ভয়াবহ।"

(দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১৭)

৪ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি সংখ্যক-১৭। সূত্র ১

পত্র-৯

১ ১৬ নবেম্বর, ১৯৩৮, সজনীকান্ত ঢাকা থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন।

২ এই চিঠিতে সজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথের লেখা ১১/১১/৩৮ তারিখের চিঠির প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়েছেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১৭)

৩ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত পত্র সংখ্যা-১৪। সূত্র-৬

৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়, 'বাংলা ভাষা পরিচয়'এর ভূমিকাটি প্রকাশিত হবার পূর্বে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনের জন্য প্রুফটি শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন। কারণ প্রয়োজনে কিছু রদবদল করতে হয়েছিল প্রবন্ধটিতে।

পত্র-১০

চিঠির উপরাংশে বাঁদিকে লাল কালিতে 'file' শব্দটি বড় করে লেখা রয়েছে।

১ ১৯৩৮-এর ডিসেম্বর মাসেই 'কাব্য-পরিচয়'এর পাণ্ডুলিপি প্রেসে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সেই সুবাদে কবির কাছ থেকে 'কাব্য-পরিচয়' সংক্রান্ত শেষ চিঠি আসে, ২৯/১১/৩৮ তারিখে লিখিত এলাহাবাদের একজন আধুনিক কবির একটি সুদীর্ঘ পত্রের প্রথমাংশে রবীন্দ্রনাথের "মার্জিনাল মন্তব্য সহ"। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-১৮)।

২ সুরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহোদর। খ্যাতনামা কবি। 'হিন্দোল', 'তুষার', 'বৈকালী' ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁর কাব্যশক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৪৯।

৩ গুরুসদয় দত্ত ১৮৮২-১৯৪১। ১৯০৩ সালে বিলেত যাত্রা করেন ও তিনি ১৯০৫-এ আই.সি.এস. পাস করে কর্মজীবনের সূচনা করেন 'আরা' জেলায়। তিনি ছিলেন ব্রতচারী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, ৭/২/১৯৩২-এ ব্রতচারী প্রতিষ্ঠা করেন। কাউন্সিল অফ্ স্টেটের সরকার নির্বাচিত সদস্য থাকাকালীন গুরুসদয় দত্ত 'নিখিল ভারত লোকগীতি ও লোকনৃত্য সমিতি' গঠন করেন।

৪ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত ১৮-সংখ্যক পত্রের সূত্র-১।

৫ 'কাব্য-পরিচয়' সংক্রান্ত কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। সেইসঙ্গে পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত হচ্ছে। 'আগামী মঙ্গলবার' অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৮, সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি নির্বাচন সমিতির দ্বারা অনুমোদিত হলে। অনুমোদিত পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে আসবেন বলে চিঠিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সজনীকান্ত।

'আত্মস্মৃতি'তে সজনীকান্ত লিখেছেন : ২রা ডিসেম্বর ১৯৩৮, 'কাব্য-পরিচয়'-এর পাণ্ডুলিপি তিনি কিশোরীমোহন সাঁতরার কাছে জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর ৩/১২/৩৮ তারিখের চিঠিটি অন্যরূপ সাক্ষ্য দেয়।

মনে হয় আত্মস্মৃতি রচনাকালে সজনীকান্তের ৩/১২/৩৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠির কথা সম্পূর্ণ বিস্মরণ হয়। (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫০৭)।

এ-বিষয়ে ২৩/১/৩৯ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লেখা কিশোরীমোহন সাঁতরার চিঠি বিশেষ উল্লেখ্য—

"গত শুক্রবার [২০/১/৩৯] বাংলা কাব্য-পরিচয়ের শেষ মিটিং হয়ে গেছে। দুটি scheme তৈরী হয়েছে। এগুলি নিয়ে ২৭-২৮ জানুয়ারী সজনী ওখানে যাবে।" (দ্র. দেশ সাহিত্য সংখ্যা-১৩৮৯, পৃ. ২৪)

৬ কিশোরীমোহন সাঁতরা।

৭ বিশ্বভারতী প্রকাশনালয়ের তৎকালীন অধিনায়ক কিশোরমোহন সাঁতরার কাছে সজনীকান্ত জানতে পেরেছিলেন, "মাসীমা"—হেমন্তবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের "চিঠি ছাপা হচ্ছে"। কিন্তু এই চিঠি প্রকাশের

প্রস্তাবে সজনীকান্তের বিশেষ সমর্থন ছিল না। তাই তিনি এই পত্রযোগে চিঠির ওপর গ্রহণ-বর্জন-পরিবর্তন ঘটিয়ে অত্যাচারে বিরত হতে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন।

পত্র-১১

চিঠির উপরাংশে বাঁদিকে কোণে লাল কালিতে "file" শব্দটি লেখা আছে।

চিঠির নীচে একটি নোট পাওয়া যায়— : "মৌখিক স্থির / মেদিনীপুর যাওয়ার কথা / ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কিম্বা নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে / অর্থাৎ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ফিরে যাবার পর। স্বাক্ষরের SKRC / [Sudhakanta Roychowdhury?] পর তারিখ রয়েছে 10/11/39।

১ মংপু থেকে ১১/১০/৩৯ তারিখে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির প্রাপ্তি সংবাদ দিয়েছেন সজনীকান্ত। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-২০)

২ মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা সমিতির ঐকান্তিক বাসনা ছিল রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে উক্ত মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা। সজনীকান্তের উপর তাঁরা দায়িত্ব দিয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথকে এই ক্ষেত্রে রাজি করিয়ে মেদিনীপুরে উপস্থিত করা অবধি। মংপু থেকে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় নামলে, সজনীকান্ত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে এই সম্বন্ধে আলোচনার অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন এই চিঠির মাধ্যমে।

৩ ১৩৪৬ কার্তিক, 'শনিবারের চিঠি'তে 'রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী'র প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিল। তারই একটি কপি সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠান, 'রচনাপঞ্জী' সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানার অভিপ্রায়ে।

৪ সেই সময়ে সজনীকান্তের দপ্তরে রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের নামী ও বেনামী রচনাকে কেন্দ্র করে নানাবিধ প্রশ্ন জমা হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে সজনীকান্ত নিজের প্রশ্নের মীমাংসা করার অভিপ্রায়ে পত্রশেষে জানতে চেয়েছেন যে কবি কবে নাগাদ কলকাতায় আসবেন।

পত্র-১২

এই পত্রটি বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারের সংগ্রহে নেই। পত্রটি 'আত্মস্মৃতি'তে প্রকাশিত হয়। বর্তমান গ্রন্থের জন্যে এই পত্রটি 'আত্মস্মৃতি' থেকে গৃহীত হয়েছে। (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৫৩৩-৩৪)

১ "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র" রচনাটির বিষয়ে দ্রষ্টব্য—

ক) রবীন্দ্রনাথের পত্র-২১।

খ) 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য', পৃ. ১৬৮-৭০।

গ) 'রবিজীবনী' ১, পৃ. ১৬৩-৬৫।

পত্র-১৩

পত্রের উপরে বাঁদিকে লেখা আছে, "গুরুদেব উত্তর দিয়েছেন ৩০/১১/৩৯"। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-২৭)

১ কলকাতায়, ২৯/১১/৩৯ তারিখের সকালে, সজনীকান্তের সঙ্গে সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর, রবীন্দ্রনাথের মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরেব দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে "যাওয়া নিয়ে" আলোচনা হয়েছিল। এইক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতানুসারেই সকল রকম ব্যবস্থাদির আয়োজন করা হবে বলে, সজনীকান্ত কবিকে ২৯/১১/৩৯ তারিখে লেখা পত্রে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-২৯। ঐ সূত্র-২)

২ ২৩/১১/৩৯ তারিখে : পত্রযোগে, রবীন্দ্রনাথ, তৎকালীন 'রচনাবলী মুদ্রণের অধিনায়ক' পুলিনবিহারী সেনকে রচনাবলীতে পাঠভেদ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের ২৭-সংখ্যক পত্রের সূত্র-৩)

সজনীকান্ত সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রযোগে 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন'-এর পাঠভেদ সমেত মুদ্রণে কিছু প্রযুক্তিগত সুবিধে অসুবিধে সম্পর্কে তাঁর অভিমত রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন।

৩ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্র সংখ্যা-২৭

৪ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত পত্র সংখ্যক-২৭। সূত্র-৪

৫ দ্র. বঙ্কিম রচনাবলী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত। পত্র-সংখ্যা-২৮

পত্র-১৪

চিঠির উপরে বাঁদিকে লেখা রয়েছে "গুরুদেব উত্তর দিয়েছেন ৬/১২/৩৯"। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-২৯)

১ ৩০/১১/৩৯ তারিখে সজনীকান্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-২৭)

২ ১/১২/৩৯ তারিখে লেখা বঙ্কিম রচনাবলী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-২৮)

৩ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লেখা ২৯-সংখ্যক পত্র। সূত্র ২

৪ দ্র. সজনীকান্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির সংখ্যা-২৭। সূত্র-১

৫ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি, সংখ্যা। ২৯। সূত্র-৪

৬ দ্র. সজনীকান্তকে লিখিত দলিল ও তৎসংলগ্ন সজনীকান্ত কৃত-রচনার তালিকা, পত্র-সংখ্যা-২৪

৭ দ্র. সজনীকান্তের প্রেরিত টেলিগ্রাম—পত্র সংখ্যা-১৫

পত্র-১৫

১ উক্ত টেলিগ্রামটি সজনীকান্ত ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৯ এ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্‌ঘাটনের দিবসের জন্য রবীন্দ্রনাথের যাত্রার আয়োজনের সমস্তরকম ব্যবস্থাদি করে ১৪ ডিসেম্বর সন্ধেতে সজনীকান্ত শান্তিনিকেতনে পৌঁছবেন। টেলিগ্রামে এই বার্তাই ছিল।

'আত্মস্মৃতি'তে যদিও সজনীকান্ত ১৩ ডিসেম্বরে তাঁর শান্তিনিকেতনে রওনা হবার কথা লিখেছিলেন। তথাপি মনে হয় রচনাকালে তাঁর টেলিগ্রামের কথা স্মরণে ছিল না। (দ্র. 'আত্মস্মৃতি' পৃ: ৫৪১)।

পত্র-১৬

চিঠির উপরে বাঁদিকে লালকালিতে 'R' অক্ষরটি লেখা আছে।

১ দ্র. সজনীকান্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি সংখ্যা-৩০। সূত্র-৩

২ পরবর্তী রবিবার-১৪ জানুয়ারি, ১৯৪০।

৩ অনিলকুমার চন্দ (১৯০৬-১৯৭৬)। শান্তিনিকেতনে ১৯২১ সালে তিনি পড়াশুনো করতে এসেছিলেন। এবং ১৯৩৩ সাল থেকে অনিল চন্দ বিশ্বভারতীর দায়িত্ববাহী সমস্ত সভার সদস্য ছিলেন।

পরবর্তী ১৪/১/৪০, রবিবার প্রত্যুষে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতের অভিলাষী হয়ে ১০/১/৪০ তারিখে অনিল চন্দকে একটি চিঠিতে লেখেন :

"প্রীতিভাজনেষু,

অনিলবাবু...

রচনাবলীর কাজের জন্যে আমার একবার তাঁর কাছে যাওয়া দরকার, কতগুলো জিনিষ দেখিয়ে নেবার আছে। বাংলা বানান সম্বন্ধে তিনি কিছু পরামর্শ করতে চান। রবিবার সকালে আটটার গাড়ীতে আমি যেতে চাই,...। আপনার অনুমতি পেলে রওয়ানা হব।...

ইতি—

শ্রীসজনীকান্ত দাস"

৪ দ্র. রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির সংখ্যা ৩০, সূত্র-৪

পত্র-১৭

চিঠির উপরে বাঁদিকে লাল কালিতে 'important file' বলে একটি নোট পাওয়া যায়।

১ ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৬)। কলকাতার সম্ভ্রান্ত ক্রীশ্চান পরিবারে জন্ম। ১৯১৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনিই প্রথম ভারতীয়, পিএইচ.ডি. ডিগ্রিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯১৪ সাল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন ও ১৯৩৬-৪০ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়েছিলেন।

তাঁরই নির্দেশে অমিয় চক্রবর্তীর দরখাস্তটি যেন ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা পড়ে কবিকে সেই তথ্য জানিয়েছিলেন সজনীকান্ত। এছাড়াও কিছু প্রয়োজনীয় গোপন তথ্যও ছিল এই চিঠিটিতে।

২ অমিয় চক্রবর্তী।

৩ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৫৩)। ১৯৩৪ সাল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

৪ প্রফুল্ল ঘোষ—(১৮৮৩-১৯৪৮)। পিতা ঈশানচন্দ্র ঘোষ। বিখ্যাত ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। ১৯০৮ থেকে একাদিক্রমে ৩১ বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৯-এ অবসর গ্রহণ করেন।

৫ সজনীকান্তকে রবীন্দ্রনাথ মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে 'অবচেতনার অবদান' নামে যে ছবিটি এঁকে সমর্পণ করেছিলেন তাঁকে, তার উপর একটি কবিতা লিখে দেবেন। সজনীকান্ত এই পত্রযোগে কবির কাছে কবিতাটি প্রার্থনা করেছিলেন। এই সুবাদে রবীন্দ্রনাথের উত্তর আসে ২০ জানুয়ারি, ১৯৪০।

(দ্র. ক) রবীন্দ্রনাথের পত্র-৩২। সূত্র ১।

খ) 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩৪৪।

গ) রবীন্দ্র-রচনাবলী ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৪৭০।

৬ তৎকালীন মেদিনীপুর জেলা অধিকর্তা বিনয়রঞ্জন সেন।

৭ ঝাড়গ্রাম রাজা কুমারনরসিংহ দেবমল্ল।

পত্র-১৮

১ ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৪০, রবীন্দ্রনাথ পত্রযোগে সজনীকান্তকে শান্তিনিকেতনে আসার জরুরি তলব করেছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-৩৩)

২ রচনাবলী প্রকাশনালয়ের অধিকর্তা কিশোরীমোহন সাঁতরা অসুস্থ হওয়ায়, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন পুলিনবিহারী সেন। রচনাবলী সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলছে—সেই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তকে পত্রযোগে ডেকে পাঠালেন বিশেষ প্রয়োজনে।

(দ্র. রবীন্দ্রনাথের লিখিত ৩৩-সংখ্যক পত্রের সূত্র-১)

৩ পুলিনবিহারী সেন ও অমিয় চক্রবর্তী।

৪ পরবর্তী রবিবার ছিল—৪/২/১৯৪০ তারিখ।

৫ অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'খসড়া' ১৯৩৮-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথমে 'খসড়া' সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানান নি। কারণ এই ধরণের আধুনিক কবিতা তাঁর ভালো লাগে না সেটাই হয়তো প্রধান অন্তরায় ছিল না। এই মর্মে কবি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৮ অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লেখেন—"খসড়া সম্বন্ধে লিখব ঠিক

করেছিলুম"—কিন্তু "ভয় হোলো পাছে বাংলা আধুনিকরা মনে করে আমি তাদেরই জয়ধ্বনি করছি।"

এর কিছুকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ, 'নবযুগের কাব্য' প্রবন্ধে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। (দ্র. 'অমিয় চক্রবর্তী', পৃ. ৩৫-৩৬)

৬ 'খসড়া' প্রকাশের একবছর পরে ১৯৩৯-এর ডিসেম্বরে, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের পৌষে অমিয় চক্রবর্তীর 'একমুঠো' কাব্য-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'একমুঠো' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন অমিয় চক্রবর্তীর আধুনিকতা ও নবীনতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হল। (দ্র. 'কবির চিঠি কবিকে', পৃ. ১৭-১৯ ; 'অমিয় চক্রবর্তী', পৃ. ৩৫-৩৬)

পত্র-১৯

চিঠির নীচে লাল কালিতে 'file' শব্দটি লেখা আছে।

১ বাঁকুড়া থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ ৮/৩/৪০ তারিখে সজনীকান্তকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সজনীকান্ত কবির এই চিঠিটি পড়ে খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-৩৫)

২ দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (১৮৯০-১৯৫১)। প্রায় ২১ বছর ঝাড়গ্রামের রাজার ম্যানেজার ছিলেন। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় ও রাজার অর্থানুকূল্যে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর হল, বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দির ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে 'ঝাড়গ্রাম রাজগ্রন্থমালা তহবিল' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহু গ্রন্থ প্রকাশেরও ব্যবস্থা হয়।

রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ঝাড়গ্রাম-রাজ 'কুমার নরসিংহ মল্লদেব'এর কাছ থেকে কিছু আর্থিক আনুকূল্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর জন্যে এই প্রাপ্তিযোগে কিছু বিলম্বের সম্ভাবনাও তিনি সজনীকান্তকে জানিয়েছিলেন। সজনীকান্ত কবিকে চিঠিতে সেই সংবাদ জানিয়েছিলেন।

৩ রবীন্দ্রনাথ ৮/৩/৪০ তারিখের চিঠিতে জানতে চেয়েছিলেন— সজনীকান্ত কবে নাগাদ শান্তিনিকেতনে আসবেন। যদিও সেই সময় সভাপতিত্বের দায় ও বক্তৃতা দিতে ব্যস্ত থাকবেন তবু তিনি কবির কাছে

যেতে প্রতিশ্রুত।

৪ দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-৩৫

৫ দ্র. সজনীকান্তের ১৭-সংখ্যক পত্রের সূত্র ৫

৬ 'শনিবারের চিঠি' ১৩৪৬ চৈত্র, ১২শ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যায়, রবীন্দ্রনাথের 'মাছি তত্ত্ব' কবিতাটি প্রকাশিত হয় (পৃ. ৭৭১-৭৪)। দ্র. 'প্রহাসিনী', রচনা ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০।

পত্র-২০

১ ঝাড়গ্রামের রাজা কুমার নরসিংহ মল্লদেব।

২ অনিলকুমার চন্দ।

৩ পরবর্তী বৃহস্পতিবার—২১/৩/৪০।

৪ সোমবারে তারিখ ছিল—২৫/৩/৪০।

পত্র–২১

১ বায়োকেমিক মতে নেট্রাম সালফ ডায়বেটিসের প্রধান ওষুধ। রবীন্দ্রনাথের বায়োকেমিক মতে চিকিৎসার নির্দেশানুযায়ী, সজনীকান্তের ওই ওষুধে ভাল ফল হয়েছিল। (দ্র. রবীন্দ্রনাথের পত্র-৩৮)

২ বোরিক অ্যাণ্ড ডিউয়ির বায়োকেমিক চিকিৎসার বই—'টুয়েলভ টিসু রেমেডিজ'।

৩ এইবার রবীন্দ্রনাথ কালিম্পঙ অভিমুখে যাত্রা করেন ২০ এপ্রিল, ১৯৪০। কালিম্পঙ থেকে কবি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন আষাঢ়ের মাঝামাঝি—২৯ জুন, ১৯৪০। (দ্র. 'রবীন্দ্রজীবনী' ৪, পৃ. ২৩১-৩৯)

সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশের সূচী :
সজনীকান্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
১	"গোরার কোন্ জায়গা হইতে উদ্ধৃত"	4/3/1922	২০ ফাল্গুন ১৩২৮	শান্তিনিকেতন	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৫৪ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২০
২	"কঠিন আঘাতে একটা আঙুল"	9/3/1927	২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩	Santiniketan Bengal, India	শনিবারের চিঠি, ভাদ্র, ১৩৩৪ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ৪৪
৩	"তোমার বিদ্রূপের প্রখর অগ্নিবাণে"	14/11/1927	২৮ কার্তিক, ১৩৩৪	শান্তিনিকেতন	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ১২৮ বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৬০
৪	"দোহাই তোমাদের, 'শনিবারের চিঠি'তে"	19/11/1927	৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪	শান্তিনিকেতন	বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৬০ আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ১২৮ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ৫৫

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
৫	"আত্মশক্তিতে কয়েক সংখ্যা ধরে"	13/12/1927	২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪	6, Dwarkanath Tagore Lane Calcutta	বসুমতী, শ্রাবণ, ১৩৬০ আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৪ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ৮৯
৬	"I know Babu SajaniKanta" (শংসাপত্র)	13/2/1928	৩০ মাঘ ১৩৩৪	শান্তিনিকেতন	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৬ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ৬০
৭	"চেষ্টা করব কিন্তু কি রকম"	4/3/1928	২০ ফাল্গুন, ১৩৩৪	শান্তিনিকেতন	বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৬০ আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ১২৯ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ৬০
৮	"মনে করেছিলুম তোমার"	26/12/1929	১১ পৌষ, ১৩৩৬	—	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ১৯৩
৯	"I hereby appoint" (নিয়োগ পত্র)	25/7/1938	৯ শ্রাবণ, ১৩৪৫	—	রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৬০

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
১০	"ভুলেই গিয়েছিলুম।"	6/9/1938	২০ ভাদ্র, ১৩৪৫	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩২৪ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৬২
১১	"আমার দোষ নেই।"	15/9/1938	২৯ ভাদ্র, ১৩৪৫	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩২৪ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৬৩
১২	"দুখণ্ড অলকা পেয়েছি।"	28/9/1938	১১ আশ্বিন, ১৩৪৫	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩২৫ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৬৪
১৩	"আমি পলাতকা।"	7/10/1938	২০ আশ্বিন, ১৩৪৫	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩২৬ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৬৪
১৪	"মস্ত একটা ছিদ্র আছে"	21/10/1938	৪ কার্তিক, ১৩৪৫	Santiniketan, Bengal	'শনিবারের চিঠি', ১৩৬২ 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮৯ আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩২৭

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
১৫	"দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"	27/10/1938	১০ কার্তিক, ১৩৪৫	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	'শনিবারের চিঠি' অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৬৭ আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩২৭
১৬	"সর্বত্রই লেখা দিয়ে থাকি"	31/10/1938	১৪ কার্তিক, ১৩৪৫	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ 'আত্মস্মৃতি', ১৯৯৬, পৃ. ৩২৯ 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', ১৩৮০, পৃ. ১৬৮
১৭	"রঙ্গমঞ্চে মুক্তির উপায়ের"	11/11/1938	২৫ কার্তিক, ১৩৪৫	শান্তিনিকেতন	'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৩০ 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', ১৩৮০, পৃ. ১৬৯
১৮	"কাব্য-পরিচয় দ্বিতীয়"	29/11/1938	১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫	শান্তিনিকেতন	'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ 'আত্মস্মৃতি' ১৯৯৬, পৃ. ৩৩১ 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', ১৩৮০, পৃ. ১৭০

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
১৯	"আগামী সংস্করণ কাব্য-পরিচয়"	30/11/1938	১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫	শান্তিনিকেতন	শনিবারের চিঠি, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬৮
২০	"পূজোর ছুটি এখানে কাটিয়ে"	11/10/1939	২৪ আশ্বিন, ১৩৪৬	মংপু	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪৭ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০ পৃ. ১৭১
২১	"তুমি আমাকে মুস্কিলে ফেললে"	15/10/1939	২৮ আশ্বিন, ১৩৪৬	মংপু, দার্জিলিং	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪৮ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৭২
২২	"এখান থেকে ৫ই নবেম্বর"	19/10/1939	২ কার্তিক, ১৩৪৬	মংপু, দার্জিলিং	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪৯ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৭৩
২৩	"৫ই নবেম্বর এখান থেকে"	26/10/1939	৯ কার্তিক, ১৩৪৬	মংপু	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৪৯ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৭৫

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
২৪	"শ্রীমান সজনীকান্ত"	21/11/1939	৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬	শান্তিনিকেতন	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫০ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৭৬ রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য, ২০০১, পৃ. ৯৫
২৫	"সাহিত্যে অবচেতন চিত্তের সৃষ্টি"	21/11/1939	৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬	শান্তিনিকেতন	শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬
২৬	"গাছতলায় শুক্‌নো পাতার নীচে"	—	—	শান্তিনিকেতন	শনিবারের চিঠি, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৬৭-৬৮
২৭	"তোমার কাছ থেকে তাড়া"	30/11/1939	১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫১ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৭৯ (আংশিক)
২৮	"শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়" (অভিমত)	1/12/1939	১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	—

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
২৯	"সুধাকান্তকে বাহন করে"	6/12/1939	২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬	শান্তিনিকেতন	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫২
৩০	"নাৎনীর অতলস্পর্শ"	4/1/1940	১৯ পৌষ, ১৩৪৬	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫৫ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৮৫, (আংশিক)
৩১	"যখন মন্ত্রী অভিষেক"	5/1/1940	২০ পৌষ, ১৩৪৬	শান্তিনিকেতন	রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য, ২০০০, পৃ. ২১৪
৩২	"অবচেতনার অবদান"	20/1/1940	৬ মাঘ, ১৩৪৬	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫৫ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৯০
৩৩	"আগামী রবিবারে"	1/2/1940	১৮ মাঘ, ১৩৪৬	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫৬ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৮৬

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
৩৪	"ন খলু ন খলু"	28/2/1940	১৫ ফাল্গুন, ১৩৪৬	Santiniketan, Bengal India	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫৬ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৮৬
৩৫	"বাঁকুড়ায় যে রকম খাটতে"	8/3/1940	২৪ ফাল্গুন, ১৩৪৬	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫৬ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ১৯২ (আংশিক)
৩৬	"সজনী প্রতিশ্রুত ছিলুম"	18/5/1940	৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭	গৌরীপুর ভবন, কালিম্পঙ	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৫৯ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২০৩
৩৭	"দীর্ঘকাল তোমার কাছ থেকে"	3/6/1940	২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭	কালিম্পঙ	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬০ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২০৭
৩৮	"সকল বিষয়েই আমি"	6/6/1940	২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭	কালিম্পঙ	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬০ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২০৭

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশকাল
৩৯	"আমার ওষুধে ফল পেয়েছে।"	20/6/1940	৬ আষাঢ়, ১৩৪৭	কালিম্পঙ	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬১ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২০৮
৪০	"তোমার বায়োকেমিক বন্ধুর"	28/7/1940	১২ শ্রাবণ, ১৩৪৭	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬১ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২০৮
৪১	"শরীরটা অত্যন্ত ক্লান্ত"	10/9/1940	২৫ ভাদ্র, ১৩৪৭	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬২ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২১১
৪২	সজনী, গল্পসল্প তোমার"	28/5/1941	১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি ১৯৯৬, পৃ. ৩৬৩ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২১৬
৪৩	"সজনী তুমি ক্ষণকালের জন্যে"	4/6/1941	২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭	'Uttarayan' Santiniketan, Bengal	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬৪ রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত, ১৩৮০, পৃ. ২১৭

সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশের সূচী :
রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সজনীকান্ত দাসের পত্র

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশিত
১	"সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ"	8/8/1926	২৩ ফাল্গুন, ১৩৩৩	১/১ য়ুরোপীয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা	শনিবারের চিঠি, ১৩৩৪, ভাদ্র, পৃ. ১-৯ কল্লোল যুগ, ১৩৯৫, পৃ. ১১৬-১৮
২	"সাপ্তাহিক আত্মশক্তির কয়েক সংখ্যা"	13/12/1927	২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪	91 Upper Circular Rd., Calcutta	আত্মস্মৃতি, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৩
৩	"মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট"	5/9/1938	১৯ ভাদ্র, ১৩৪৫	রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা	—
৪	" 'মুক্তির উপায়' এখন পাইনি"	14/9/1938	২৮ ভাদ্র, ১৩৪৫	Visva-Bharati 210, Cornwallis Street Calcutta	—

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশিত
৫	"আজ দুকপি 'অলকা' আপনার নামে"	26/9/1938	১ আশ্বিন, ১৩৪৫	রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা	—
৬	"সুধাদার নির্দেশ মত আমরা আগামী শনিবার"	30/10/1938	১৩ কার্তিক, ১৩৪৫	২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা	—
৭	"নাচনের চিঠির নকল"	2/11/1938	১৬ কার্তিক, ১৩৪৫	২৫/২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা	—
৮	"আপনাকে অসুস্থ দেখে এসেছি"	10/11/1938	২৪ কার্তিক, ১৩৪৫	Visva Bharati Book Shop 210, Cornwallis Street Calcutta	—
৯	"কাল ঢাকা হইতে ফিরিয়া"	17/11/1938	১ আগ্রহায়ণ, ১৩৪৫	২৫/২ মোহনবাগান রো কলিকাতা	—

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশিত
১০	"আপনার মার্জিনাল মন্তব্য"	3/12/1938	১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫	রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা	—
১১	"আপনার পত্র পেয়েছি"	13/10/1939	২৬ আশ্বিন, ১৩৪৬	২৫/২ মোহনবাগান রো কলিকাতা	—
১২	"সেই সময়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"	17/10/1939	৩০ আশ্বিন, ১৩৪৬	২৫/২ মোহনবাগান রো কলিকাতা	—
১৩	"আজ সকালে সুধাদার সঙ্গে"	29/11/1939	১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬	25/2 Mohanbagan Row Calcutta	—
১৪	"আপনার পত্র এবং"	5/12/1939	১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬	25/2 Mohanbagan Row Calcutta	—
১৫	'Telegram'	14/12/1939	২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬	—	—

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ (ইংরাজি)	তারিখ (বাংলা)	স্থান	সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে প্রকাশিত
১৬	"ইংরেজী স্বত্ব বহির্ভূত"	10/1/1940	২৫ পৌষ, ১৩৪৬	25/2 Mohanbagan Row Calcutta	—
১৭	"ডক্টর হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে"	18/1/1940	৪ মাঘ, ১৩৪৬	২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা	—
১৮	"আপনার সমন পাইলাম"	3/2/1940	২০ মাঘ, ১৩৪৬	২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা	—
১৯	"আপনার সামান্য পাঁচ ছত্রের পত্র"	12/3/1940	২৮ ফাল্গুন, ১৩৪৬	২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা	—
২০	"মেদিনীপুর আসিয়াছি"	18/3/1940	৫ চৈত্র, ১৩৪৬	মেদিনীপুর	—
২১	"আপনার ওষুধ খেয়ে"	28/6/1940	১৪ আষাঢ়, ১৩৪৬	25/2 Mohanbagan Row Calcutta	—

সজনীকান্তের চিঠি রবীন্দ্রনাথকে লেখা যেগুলি পাওয়া যায় নি অথচ আত্মস্মৃতিতে চিঠি প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে।

সংখ্যা	পত্রারম্ভ	তারিখ	আনুমানিক স্থান	প্রেরিত স্থান
১	ভাষাবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ ও তাহা সুনীতিকুমারকে উৎসর্গ	২৫/১০/৩৮	কলকাতা	শান্তিনিকেতন
২	মেদিনীপুরের বিষয় ও রবীন্দ্র-রচনার উদ্ধার	৯/১০/১৯৩৯	কলকাতা	মংপু
৩	জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয় রচিত কবির লেখা সম্পর্কে	১২/১০/১৯৩৯	কলকাতা	মংপু
৪	সজনীদাসের স্বাস্থ্য সম্পর্কে	১/৬/১৯৪০	কলকাতা	কালিম্পং
৫	সজনীদাসের কুশল বিষয়ে	৩/৬/১৯৪০	কলকাতা	কালিম্পং
৬	গল্পসল্প সম্পর্কে	২৫/৫/৪১	কলকাতা	শান্তিনিকেতন

‘শনিবারের চিঠি’তে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার তালিকা

	প্রকাশকাল	সংখ্যা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা	রচনা প্রসঙ্গে বিশেষ মন্তব্য (সম্পাদকীয়)
১	১৩৩৪, মাঘ	বর্ষ ১, সংখ্যা ৬	রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত	চিঠি	৩৭৩	—
২	১৩৪৫, আষাঢ়	বর্ষ ১০, সংখ্যা ৯	বঙ্কিমচন্দ্র	প্রবন্ধ	৪৫৯	—
৩	১৩৪৫, অগ্রহায়ণ	বর্ষ ১১, সংখ্যা ২	অতি আধুনিক ভাষা	ব্যঙ্গরচনা	১৫৩-৫৮	‘সপ্তপারবর্তী কবি’ ছদ্মনামে রচিত
৪	১৩৪৬, অগ্রহায়ণ	বর্ষ ১২, সংখ্যা ২	অবচেতনার অবদান	ব্যঙ্গ কবিতা	২৯৪-৯৭	সাহিত্যে অতি আধুনিকতাকে (ব্যঙ্গ করে কবিতাটি রচিত, সঙ্গে চিত্রও আছে।)
৫	১৩৪৬, পৌষ	বর্ষ ৩২, সংখ্যা ৩	বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির	অভিভাষণ	৪৩৬-৪০	বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির প্রবেশ উৎসবে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত অভিভাষণ।

	প্রকাশকাল	সংখ্যা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা	রচনা প্রসঙ্গে বিশেষ মন্তব্য (সম্পাদকীয়)
৬	১৩৪৬, মাঘ	বর্ষ ১২, সংখ্যা ৪	মন্ত্রী অভিষেক	প্রবন্ধ	৪৭৫-৯৫	—
৭	১৩৪৬, ফাল্গুন	বর্ষ ১২, সংখ্যা ৫	শেষ কথা	গল্প	৬২১-৫৫	৩০ অগ্রহায়ণ তারিখে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ছোটগল্প' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প প্রকাশিত হয়। 'শেষকথা' গল্পটি সেই গল্পেরই আদিরূপ। এই গল্পে-চিত্রিত রুচিরার চরিত্রটি সম্পাদকের অধিক লোভনীয় মনে হওয়ায় এটি তিনি প্রকাশ করেন।
৮	১৩৪৬, চৈত্র	বর্ষ ১২, সংখ্যা ৬	মাছিতত্ত্ব	কবিতা	৭৭১-৭৭৪	—
৯	১৩৪৭, বৈশাখ	বর্ষ ১২, সংখ্যা ৭	ছিটে ফোঁটা	কবিতা	১-৩	—

	প্রকাশকাল	সংখ্যা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা	রচনা প্রসঙ্গে বিশেষ মন্তব্য (সম্পাদকীয়)
১০	১৩৪৭, জ্যৈষ্ঠ	বর্ষ ১২, সংখ্যা ৮	বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র	প্রবন্ধ	১৬২-৬৩	—
১১	১৩৪৭, মাঘ	বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৪	প্রশ্ন	কবিতা	৪৪৬	—
১২	১৩৪৮, ভাদ্র	বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১১	ছড়া	ব্যঙ্গ কবিতা	৫৯৩	শনিবারের চিঠির জন্য লিখিত।
১৩	১৩৪৮, আশ্বিন	বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১২	তবু মরিতে হবে	কবিতা	৮০৫	রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনা
১৪	১৩৪৮, আশ্বিন	বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১২	ক্ষণিকা	পত্র	৭৩৮-৪০	প্রিয়নাথ সেনকে লেখা পত্র
১৫	১৩৪৮, আশ্বিন	বর্ষ ১৩, সংখ্যা ১২	যাবার দিন	ছোট কবিতা	৮৫৫	—
১৬	১৩৫০, বৈশাখ	বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৭	বিসর্জন	কবিতা	১	অমলা রায়চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত কবিতা

	প্রকাশকাল	সংখ্যা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা	রচনা প্রসঙ্গে বিশেষ মন্তব্য (সম্পাদকীয়)
১৭	১৩৫১, মাঘ	বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৩	বাংলার নবযুগ : পরিশিষ্ট	প্রবন্ধ	১৮৩-৯৮, ২৩৫-৪০	—
১৮	১৩৫৩, অগ্রহায়ণ	বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২	সুপ্রভাত	কবিতা	৮৫	—
১৯	১৩৫৩, অগ্রহায়ণ	বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২	মহারাজ	কবিতা	১০০	—
২০	১৩৬৮, বৈশাখ	বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ৭	করুণা	উপন্যাস	৯	ভারতী পত্রিকায় পূর্ব-প্রকাশিত।

'অলকা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনা ও রবীন্দ্র-বিষয়ক রচনার তালিকা

'অলকা' মাসিক পত্রিকা

পরিচালক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার / কার্য্যালয়—৭৭ ধর্ম্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা / শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত / শ্রীপ্রবোধচন্দ্র নান কর্তৃক শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ৩৬/১ এল্‌গিন রোড হইতে প্রকাশিত।

সজনীকান্ত দাস 'অলকা' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন আশ্বিন ১৩৪৫ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ পর্যন্ত, 'অলকা' ১ম বর্ষ ১-৯ম সংখ্যা পর্যন্ত। ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা থেকে 'অলকা'র নতুন কার্য্যালয়—'হিমালয় হাউস', ১৫ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা।

'অলকা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্র-বিষয়ক রচনার তালিকা

	প্রকাশকাল	সংখ্যা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা	রচয়িতার নাম
১	১৩৩৪, মাঘ	বর্ষ ১ সংখ্যা ১	মুক্তির উপায়	নাটক	৫৭	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২	১৩৪৫, কার্ত্তিক	বর্ষ ১ সংখ্যা ২	'পত্রধারা'	গ্রন্থপরিচয়	১৭৮-১৮১	
	”	”	'রবীন্দ্রনাথ ও নোগুচি”	সম্পাদকীয়	১৯১	—

	প্রকাশকাল	সংখ্যা	শিরোনাম	বিষয়	পৃষ্ঠা	রচয়িতার নাম
৩	১৩৪৫, অগ্রহায়ণ	বর্ষ ১, সংখ্যা ৩	'চতুরঙ্গ'	গ্রন্থপরিচয়	২১৫-১৬	—
৪	১৩৪৫, পৌষ	বর্ষ ১ সংখ্যা ৪	'রবীন্দ্র-পরিচয়'	সচিত্র প্রবন্ধ	৩৬২-৭০	শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী
	"	"	'পাশ্চাত্য ভ্রমণ'	গ্রন্থপরিচয়	৩৭৬-৭৭	—
৫	১৩৪৫, ফাল্গুন	বর্ষ ১ সংখ্যা ৬	'ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় বাঙালীর দান'	সম্পাদকীয়	৫৭৪	—
৬	১৩৪৫, চৈত্র	বর্ষ ১ সংখ্যা ৭	'রবীন্দ্র-পরিচয়'	প্রবন্ধ	২৫-৩০	শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

গ্রন্থসূচী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৯৫

ইন্দ্র মিত্র, 'নিপাতনে সিদ্ধ', চয়নিকা, কলকাতা, ১৯৯৩

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, "বাংলা কাব্য-পরিচয় প্রসঙ্গে", 'রবীন্দ্রচর্চা', সংখ্যা ৩, রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮

গৌতম ভট্টাচার্য, 'শ্লীলতা—অশ্লীলতা ও রবীন্দ্রনাথ', প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৬

জগদীশ ভট্টাচার্য, 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩৮০

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, " 'সাহিত্যধর্ম্মের সীমানা'-বিচার", 'বিচিত্রা', বর্ষ ১, খণ্ড ১, সংখ্যা ৪, আশ্বিন ১৩৩৪, পৃ. ৫৮৭-৬০৬

নরেশ গুহ -সম্পাদিত 'কবির চিঠি কবিকে'। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অমিয় চক্রবর্তীর পত্রাবলী। প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৫

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, "সাহিত্য ধর্ম্মের সীমানা", 'বিচিত্রা', বর্ষ ১, খণ্ড ১, সংখ্যা-৩, ভাদ্র ১৩৬৪, পৃ. ৩৮৩-৯০

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম ভট্টাচার্য, "রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বাংলা কাব্য-পরিচয়", 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৯, পৃ. ১৯-৩৮

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী'–১, ২, ৩, ৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৭০, ১৯৬১, ১৯৬১, ১৯৬৪

প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী' ১-৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩, ২০০২, ১৩৯৪, ১৪০৮, ১৪০৯, ১৩৯৯, ১৪০৯, ১৪০৭

বুদ্ধদেব বসু, "বাংলা কাব্য-পরিচয়", 'কবিতা', সংখ্যা-৭, আশ্বিন ১৩৪৫, পৃ. ৫৫-৭৫

মৈত্রেয়ী দেবী, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', প্রাইমা পাবলিকেশনস, কলকাতা, ১৯৯৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা", 'বিচিত্রা', বর্ষ-১, খণ্ড ১, সংখ্যা-১, আষাঢ় ১৩৩৪ পৃ. ৯-৭০। স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশ : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ফাল্গুন ১৩৮০

"সাহিত্য ধর্ম্ম", 'বিচিত্রা', বর্ষ ১, খণ্ড ১, সংখ্যা-২, শ্রাবণ ১৩৩৪, পৃ. ১৭১-৭৫। 'সাহিত্যের পথে', বিশ্বভারতী, ১৩৪৩

"সাহিত্যে নবত্ব", যাত্রীর ডায়েরি শিরোনামে প্রকাশিত, 'প্রবাসী', ২৭শ ভাগ, খণ্ড ২, সংখ্যা ২, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ. ২১৫-২১৯। দ্রষ্টব্য 'সাহিত্যের পথে', বিশ্বভারতী, ১৩৪৩

"সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র", শনিবারের চিঠি, বর্ষ ১, সংখ্যা ৬, মাঘ ১৩৩৪, পৃ. ৩৭৩

"মুক্তির উপায়", অলকা, বর্ষ ১, সংখ্যা-১, আশ্বিন ১৩৪৫, পৃ. ৬৭-৮৮। দ্রষ্টব্য 'মুক্তির উপায়', বিশ্বভারতী, ১৩৫৫।

—'সপ্তক পরবর্তী কবি' (ছদ্মনাম), 'অতি আধুনিক ভাষা', শনিবারের চিঠি, বর্ষ ১১, সংখ্যা ২, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, পৃ. ১৫৩-৫৮। 'কবিতাটি মূল পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী এবং নাচনবাবাবু কিশোরকান্তকে 'দাদু' রবীন্দ্রনাথের পত্র রবীন্দ্রসদনের অনুলিপি অনুসরণে মুদ্রিত।..." দ্র. চিঠিপত্র ৯, পাদটীকা, পৃ. ৪৫৫।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

"বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দির', শনিবারের চিঠি, বর্ষ ১২, সংখ্যা ৩, পৌষ ১৩৪৬, পৃ. ৪৩৬-৪৪০। দ্রষ্টব্য চারিত্রপূজা।

"মন্ত্রী-অভিষেক', শনিবারের চিঠি, বর্ষ-১২ সংখ্যা-৪, মাঘ ১৩৪৬, পৃ. ৪৭৫-৯৫। দ্রষ্টব্য, অচলিত সংগ্রহ ২ ; বিশ্বভারতী, ১৯৬২

"মাছিতত্ত্ব", শনিবারের চিঠি, বর্ষ ১২, সংখ্যা ৬, চৈত্র ১৩৪৬, পৃ. ৭৭১-৭৭৪। প্রহাসিনী (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫২ পৌষ) বিশ্বভারতী।

"অবচেতনার অবদান"/ছড়া, শনিবারের চিঠি, বর্ষ ১৩, সংখ্যা-১১, ভাদ্র-১৩৪৮ পৃ. ৫৯৩। দ্র. ছড়া, বিশ্বভারতী

'চিঠিপত্র-৫, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পৌষ ১৩৫২, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ, ১৪০০

"চিঠিপত্র-৯", কানাই সামন্ত ও সনৎকুমার বাগচী কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০০

"চিঠিপত্র-১২", ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা,১৯৮৬

"চিঠিপত্র-১৬", সুতপা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৫

রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োবিংশ ; ত্রিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ, পঞ্চদশ ক ও ষোড়শ খণ্ড, (গ্রন্থ-পরিচয়), ২৫ বৈশাখ ১৪০৮, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

রাধারানী দত্ত, 'সাগর স্বপ্ন', ভারতবর্ষ, বর্ষ ১৩, খণ্ড ২ সংখ্যা ৬, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩, পৃ. ৯২০-৩৮

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, 'সাধারণ রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৯

শঙ্খ ঘোষ, "উর্বশীর হাসি", প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮১

সজনীকান্ত দাস, "আধুনিক বাংলা সাহিত্য", 'শনিবারের চিঠি', নবপর্যায় বর্ষ ১, সংখ্যা-১, ভাদ্র ১৩৩৪, পৃ. ১-৯

'আত্মস্মৃতি', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৩৮৪ ; নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬

'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১

সমর সেন, 'বাবু-বৃত্তান্ত', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১

সুধীরচন্দ্র কর, "রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্রজীবন", 'যুগান্তর', শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫৫

সুমিতা চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথের কাব্য পরিচয়। সম্পাদনা ও তথ্য সংকলন, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০৩

সুমিতা ভট্টাচার্য, 'অমিয় চক্রবর্তী' পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৮

স্বপন মজুমদার, রবীন্দ্র গ্রন্থসূচি, প্রথম খণ্ড/প্রথম পর্ব, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা, ১৩৯৫

সংকলয়িতার নিবেদন

পূর্বপ্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ, হেমন্তবালা দেবী ও সজনীকান্ত

১৩৩০ বঙ্গাব্দের ৪ আষাঢ় (১৯ জুন ১৯২৩) বীরভূমের রাইপুর গ্রাম নিবাসী ও কলকাতা প্রবাসী পশুপতিনাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুধারানীর সঙ্গে সজনীকান্তের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। সজনীকান্তের এক পুত্র ও পাঁচ কন্যা।

আমার (সংকলয়িতার) জন্মের বছর কয়েক আগেই মাতামহ সজনীকান্ত দাসের মৃত্যু হয়। দাদুকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। বয়স যখন অল্পই, একদিন বেলগাছিয়ার বাড়িতে (৫৭-এ, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড) আমার দিদিমা সুধারানী দাসের কাছে দাদুর হাতের লেখা একটি কবিতা চোখে পড়ে। কবিতাটির নাম মনে আছে— 'নির্জীব কুমার ও নির্জীব কুমারীর বিয়ে'। দিদাকে কবিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে দিদা বলেছিলেন—"তখন বোনটি আমরা থাকতুম ২৮সি, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের একটি ভাড়া বাড়িতে। তার পাশেই থাকতেন বাসন্তীরা। বাসন্তীর তখনও বিয়ে হয় নি। বাসন্তী আমার খুব বন্ধু ছিল। আমরা দুই বন্ধুতে পুতুল খেলতুম। আমার পুতুলের সঙ্গে বাসন্তীর পুতুলের বিয়ে হয়েছিল। বিশাল ধূমধাম। মাসিমা (হেমন্তবালা দেবী) অনেক রান্নার ব্যবস্থা করে অনেক ধরনের খাবারের আয়োজন করেছিলেন। রাজবাড়ির ব্যাপার—আমাদের তো তখন ভাই অত পয়সা ছিল না। তাই সেকালের রীতি অনুযায়ী তোমার দাদু আমাকে এই কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন।"

এর পরবর্তী ইতিহাস এই কবিতাটি হেমন্তবালা দেবীর দৃষ্টি-গোচর হয়। এবং ক্রমশ তিনি সজনীকান্তকে নানান ধরনের সাহিত্য নিয়ে প্রশ্ন করতেন। আমার দাদু সেগুলির উত্তর দিতেন। এই ক্ষেত্রে

দূতের ভূমিকা পালন করতেন আমার দিদিমা। আজ বলতে দ্বিধা নেই একদিন দিদা হাসতে হাসতে আমাকে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন "মাসীমা ও বাসন্তী দুজনেই চিরকুট দিয়ে তোমার দাদুর কাছে প্রশ্ন পাঠাতেন। মাঝে মাঝে তোমার দাদু এতে বিরক্ত হতেন খুব। আমি আবার তখন ঠাণ্ডা করতুম।" পরবর্তীকালে 'আত্মস্মৃতি'তে দাদু লিখেছেন— "গোড়ায় তাঁহাকে একজন স্নেহশীলা প্রতিবেশিনী মাত্র জ্ঞান করিয়াছিলাম ; কিন্তু কয়েক দিন যাইতে না যাইতে বুঝিতে পারিলাম, সহজ মধুর সম্পর্কও বিপদের কারণ হইতে পারে। মাতা হেমন্তবালা ও কন্যা বাসন্তী পরিচারিকাবাহিত চিরকুট মারফত আমার জবাব দাবি করিয়া গৃহিণীকে সাহিত্য-বিষয়ক এমন সব প্রশ্ন যখন-তখন করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন যে, আবার বাড়ি বদল করিব কিনা সে ভাবনায়ও পড়িতে হইয়াছিল।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩২৯)

পরবর্তীকালে দাদুর উত্তরের গুণে মোহিত হয়েই স্নেহপরবশে 'মাসিমা' হেমন্তবালা দেবী দাদুর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কাছে বহু চিঠি লিখেছিলেন (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ৯ দ্রষ্টব্য)। 'আত্মস্মৃতি'তে দাদু লিখেছেন— "তীক্ষ্ণবুদ্ধি মাতা অচিরকাল মধ্যে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার উপাস্য রবীন্দ্রনাথ ও নবলব্ধ পুত্রের মনান্তর দুস্তর হইলেও দুরতিক্রম্য নয়।... এই ব্যবধান তাঁহাকে পীড়িত করিত এবং গোপনে গোপনে দেবতার ও ভক্তের পুনঃসংযোগ স্থাপনে তিনিই যে পুরোহিতের ভূমিকা লইয়া ছিলেন তাহা পরে জানিতে পারিয়াছিলাম।' ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩৩০) মনে আছে দিদার কাছে শুনেছিলাম হেমন্তবালা দেবী দাদু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে যে-কোনো উপায়ে শান্ত করতে সদা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তারই ফলস্বরূপ তিনি দাদুকে পাঠান রবীন্দ্রনাথের কাছে (১৩৩৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে)।

পারস্য-ভ্রমণ-শেষে রবীন্দ্রনাথ তখন দেশে ফিরেছেন, ৩ জুন ১৯৩২। ফিরে এসে কবি কিছুদিন খড়দহে গঙ্গার গা ঘেঁষে একটি প্রাসাদে বাস করছিলেন।

এই সময় 'শনিবারের চিঠি'র জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশে এহেন গর্হিত অপরাধ করেও তাঁদের ক্রোধ প্রশমিত হয় নি তখনও আরও বেশ-কিছু 'চিঠি'র সংখ্যাতে চলছে রবীন্দ্র-বিদূষণ পর্ব। এমতাবস্থায় হেমন্তবালা দেবীর কাছ থেকে হুকুম এল সজনীকান্তকে কবির কাছে তাঁর একটি চিঠি পৌঁছে দিতে হবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন সজনীকান্ত তাঁর আত্মস্মৃতিতে। (দ্র. 'আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩৭৩-৭৫)।

দূত হিসেবে প্রেরিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রায় দুই ঘন্টা সাক্ষাতের পর সজনীকান্তের মধ্যে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন— "শরতের মেঘের মতো হালকা মনে প্রসন্ন চিত্তে ঘরে ফিরিলাম। এই সাক্ষাতের মধ্যে অপূর্ব বা অসাধারণ কিছুই ছিল না, অথচ আমি দূরবিসর্পিত নূতন পথের সন্ধান পাইলাম।" ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩৭৫)

হেমন্তবালা দেবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাতের মূলে আমার বড়ো মাসিমণি— শ্রীমতী উমারাণী দাস। দুই অসম পরিবারের মধ্যে মেলবন্ধনের সেতু রচনা করেছিলেন শিশু উমা। সেই সময় আমার মামু রঞ্জনকুমার দাস, আড়াই বছরের বালক। বলা বাহুল্য মামু ছিলেন দাদু-দিদিমার নয়নের মণি। কথা প্রসঙ্গে শুনেছিলাম একসময়ে বারীন ঘোষ দাদুর নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন। আদরের বাহুল্য দেখে বারীন ঘোষ মামুকে 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌' আখ্যা দিয়েছিলেন। মামুর দেখাশুনোর দায়িত্বে ছিলেন সরস্বতী নামা এক বৃদ্ধা এক-চক্ষু দাসী ও প্রবাসী প্রেসের হেড কম্পোজিটর মানিকচন্দ্র

দাস। অবহেলিত ছোট উমা সকলের অজ্ঞাতসারেই বাড়ির দেউড়ি পেরিয়ে প্রায়ই রাস্তায় চলে আসত। অন্তঃপুর থেকে *হেমন্তবালা* দেবীর দৃষ্টি ছিল সজাগ, তিনিই তখন ছোট্ট উমাকে নিজের বাড়িতে স্নেহবশে আবিষ্ট করতেন। ৫-এর সি থেকে খোঁজ পড়লে তখন দেখা যেত যে সে হেমন্তবালার পরম স্নেহে নানাবিধ খেলনা সামগ্রী নিয়ে আদর কুড়োচ্ছে। এই স্নেহ কর্তব্যের কথা হেমন্তবালা দেবী রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখেছেন— "আমার বিজয়ার প্রণাম নেবেন। সাংসারিক খবরের মধ্যে আপনার ভালো লাগিবার মতো নেই কিছু।...

গৌরীপুরের টাকা পাইনি। পূজোর কাপড়ের বদলে দাম চেয়ে নিয়েছিলাম ২০্। উমাকে ফ্রক পাজামা, খোকনকে প্রথমে সেলার্স সুট দিই, সুধারানীর পছন্দ হয় নি। তারপরে তার পছন্দমত সুট বদলে পাঞ্জাবী কিনে দিয়েছি।"

....সুধারানীকে ডাকিয়েছিলাম, একখানা চণ্ডী চেয়েছিলাম তাদের কাছে চণ্ডী নেই, স্তবমালা এনেছে হাতে করে। স্তবমালা তো আমারও আছে। জামাই তখনই চণ্ডী আনতে চেয়েছেন দোকান থেকে। সুধাকে বললাম সেকি হয়, এত রোদ্দুরে দোকানে হেঁটে যাবেন? থাক্ আমি তো গঙ্গাস্নানে যাবই, তখন নিয়ে আসবো। উমা, খোকন ও সুধাকে বসিয়ে গল্প করতে লাগলাম। ছেলেমেয়েরা দেখছি পাকা জার্নালিস্ট হয়ে উঠেছে। প্রবাসী, মুকুল, সঙ্গীত বিজ্ঞান নিয়ে কাড়াকাড়ি ও কামড়া-কামড়ি আরম্ভ করেছে।...."

সজনীকান্ত তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন "শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর কন্যা হেমন্তবালা দেবীই আমার নবভাগ্যোদয়ের শুকতারা।' ('আত্মস্মৃতি', পৃ. ৩২৮)। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে হেমন্তবালা যে সবসময় রবীন্দ্রনাথকে সজনীকান্তের গতিবিধি

নিয়েও চিঠি লিখেতেন, তার একটি প্রমাণ স্বরূপ দলিল— এই তারিখহীন চিঠিটি— "শ্রীযুক্ত সজনী দাসের সঙ্গে দেখা করার জন্যে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের পাড়ায় এসেছিলেন। তাহলে আমাদের পাড়াও শ্রীমন্ত হয়ে উঠ্‌ল দেখ্‌ছি।"

হেমন্তবালা দেবী রবীন্দ্রনাথকে সজনীকান্ত সম্পর্কে অনেক চিঠি লিখেছিলেন। এবং চিঠিতে চিঠিতে আক্রান্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ একটু অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন সে আলোচনা আমরা 'আত্মস্মৃতি' ও 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে পেয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন হোলো হেমন্তবালা দেবী কি সব সময়ই সজনীকান্তের গুণগান করতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে? একটি তারিখহীন চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল—"সজনীবাবু যদি আপনার শত্রু না হতেন, তা হলে আমি অত্যন্ত সুখী হতাম। কিন্তু নিরুপায়। এবারের আশ্বিনের 'শনিবারের চিঠি'তে আপনার একটু খানি প্রশংসা (অনেকখানি নিন্দাও আছে অবশ্য) বেরিয়েছে, আপনি মহাত্মাজির প্রায়োপবেশন উপলক্ষ্যে যা বলেছেন সেই জন্যে। কিন্তু গদ্য কবিতাকে "গবিতা" ও "ছবি"কে "ছবিতা" নাম দিয়ে সে সব ব্যঙ্গ, শান্তিনিকেতনকে "চল চপলায়তন" বলে যে সব কথা, ঐ গুলো আমার হজমও হয় না। আবার আপনিও সবলে ঐ গুলো অস্বীকার করে নিজের পথে চলতেই থাকবেন, প্রতীকার করবেন না। দুর্ভাগ্য দেখছি আর কারো নয়, একলা আমারি। কেউ এসব কথা আপনার কানেও তোলে না। আপনার স্বদেশী যুগের রূপটি আবার ক্ষণিকের তরে ফিরে এসেছে অনুমান করে এবারে আপনাকে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি জানিয়েছেন সজনীবাবু "শনিবারের চিঠি"তে। সেই স্বদেশী যুগের সময়কার রবীন্দ্রনাথ তো আমাদেরও চিরবরেণ্য। আজকের সমস্ত বাঙ্গালীরই পরম সম্পদ ও অন্তরের দেবতা। সেই

রূপটি হারিয়ে এখন আপনি বিশ্বের হয়েছেন, হিন্দুনিন্দুক হয়েছেন, তাই না বাঙ্গালীর পছন্দ হচ্ছে না আপনাকে। ছাড়তেও পারছে না। কেন না, আর একটি রবীন্দ্রনাথ আজও সৃষ্টি হননি। তাই আঘাত দিচ্ছে আপনাকেই। ঐ আঘাত ক্বচিৎ আমার কলমেও আসে, তবুও আমি ছাড়া আর কেউ কিছু বললে সেটা কেন যে আমার বেদনার সৃষ্টি করে, তা বলতে পারি না।"

সজনীকান্ত 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক হয়েছিলেন মাঘ ১৩৩৯ থেকে পৌষ ১৩৪১ পর্যন্ত। 'বঙ্গশ্রী'ও রবীন্দ্রনাথ রিফিউজড্ লিখে ফেরত পাঠান। সেই সময় আমার দিদিমা নববর্ষে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানিয়ে ১৩৪১ বঙ্গাব্দে একটি চিঠি লিখেছিলেন। আমার দিদা ছিলেন অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ। সম্ভবত হেমন্তবালা দেবীকে তিনিও অনেক সময় এই বিরোধের উপশম করার জন্য কিছু তদবির করতেন। এবং বোধহয় তারই আগ্রহাতিশয্যের ফলস্বরূপ তিনি নিজেই রবীন্দ্রনাথকে নববর্ষে প্রণাম জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাটি ছিল অনেক বৃহৎ ও কঠিন। তিনিই চেষ্টা করতেন সর্বদা, অন্তঃপুরবাসিনীর কাছে দাদু সম্বন্ধে সুমন্ত্রণা দিয়ে প্রথমে তাঁর হৃদয়ে পাকা আসন গড়তে। তারই উদাহরণস্বরূপ হেমন্তবালা দেবীর আর-একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত হল— "সুধারাণী বললেন, সজনীবাবু সব চিঠি পড়ে খুশীই হয়েছেন, কিছু মনে করে নি। তিনি জানিয়েছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের পরমভক্ত। তাঁর রবীন্দ্রনাথ প্রীতি অকৃত্রিম। সেই জন্যেই যা কিছুতে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যহানি বা মর্য্যাদাহানি হয়, তার বিরুদ্ধে বড় লেখনী ধারণ করে থাকেন। তিনি আপনাকে একখানি চিঠি লিখবার জন্যে আমার অনুমতি চেয়েছেন।...

মনে হচ্ছে যেন আপনার চিঠিপত্র পড়ে একটু নরম হয়েছেন এবং আমিও পূর্বোক্তগুলির সম্বন্ধে তাঁর ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করেছি।

আমার ইচ্ছা হয়, সজনীকান্তের সঙ্গে আপনার মতভেদ যদি বা থাকে, তা এমন তারা উগ্রভাবে দশজনের সামনে প্রকাশ না হোক এবং আপনার ঐ বিদ্রোহী ভক্তটিকে উদারভাবে আপনিও আত্মসাৎ করুন।"

গ্রন্থ প্রসঙ্গ

সজনীকান্ত তাঁর 'আত্মস্মৃতি'র ভূমিকায় লিখেছেন—"আমার জীবন যদি কোনদিন সম্যক ঐতিহাসিকের মর্যাদা লাভ করে, তখন তাহার কাহিনী রচনা করিবার ভার সমসাময়িক বা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের..."। ভাবী যুগের ঐতিহাসিকের ভূমিকা পালন করতে যে কতখানি সক্ষম হয়েছি সে কথা বলা বড়ো কঠিন। তবে যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে এই প্রসঙ্গকে সম্পূর্ণ গ্রন্থরূপ দেওয়ার একটি প্রয়াস করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর আজও এই বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে যথাযথ সম্পূর্ণ তথ্যের সরবরাহ না থাকায় কিছু অপূর্ণতা রয়ে গিয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গ্রন্থের জন্য বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য শ্রীযুক্ত সুজিত কুমার বসু মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার জানাই।

বিশ্বভারতীর গ্রন্থন-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুধেন্দু মণ্ডল মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশে যে ঐকান্তিক আগ্রহ ও তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমি অভিভূত। তাঁকে ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দের জন্য রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

এইসঙ্গে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

এই প্রসঙ্গে যাঁর কথা প্রথমেই মনে আসে তিনি শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায়। যাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ও ব্যক্তিগত উৎসাহ ও সাহচর্যে আজ এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভবপর হয়েছে।

সুপ্রিয়াদির সূত্রেই শ্রীপ্রশান্তকুমার পালের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আজ এই কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে প্রশান্তদার কাছেই আমার এই গ্রন্থরচনার হাতে-খড়ি হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত সাহায্য ও অভিজ্ঞ পরিচালনায় এই কাজটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হল।

শ্রীমতী আলপনা রায়, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভবনের কর্মীবৃন্দের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এক্ষেত্রে যাঁর নাম সর্বাগ্রে বলতে হয়— তিনি আশিসদা (শ্রীআশিসকুমার হাজরা)। শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা, শ্রীদিলীপ হাজরা, শ্রীতুষারকান্তি সিংহ, শ্রীমতী জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কলকাতার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীবন্ধুরাও আমাকে যথাসম্ভব যথোচিত উপকরণ ও তথ্য দিয়ে বিশেষ সাহায্য করেছেন।

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

আমার কৃতজ্ঞতা আমার পরিবারের সকল সদস্যের কাছে। বিশেষভাবে আমার মাতুল, রঞ্জনকুমার দাস, যাঁর আন্তরিক সাহায্য ও ব্যক্তিগত সংগ্রহের চিঠি প্রকাশের অনুমতি পেয়ে, আজ এই গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভব হল।

আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা সজনীকান্ত দাসের চার কন্যা— শ্রীমতী উমারানী দাস, শ্রীমতী মীরা দত্ত, শ্রীমতী সোমা বসু এবং শ্রীমতী ইরা সিকদারকে— যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ও পারিবারিক তথ্যসামগ্রীর যোগান গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করতে আমাকে প্রভূত সহায়তা করেছে। সজনীকান্ত দাসের দৌহিত্রী ড: ইন্দ্রাণী মজুমদারের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, তাঁর সুপরামর্শ ও তথ্য সরবরাহের জন্য।

সবশেষে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শ্রীসুবিমল লাহিড়ীকে। সুবিমলদা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর স্নেহ ও মমতা দিয়ে এবং অভিজ্ঞ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পাণ্ডুলিপি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গসুন্দর করার প্রয়াস করেছেন। তাঁর অপরিসীম পরিশ্রম ও বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য না করলে এই গ্রন্থের কাজটি সম্পূর্ণ হত না।

সাগর মিত্র

অশুদ্ধি সংশোধন

পৃ । ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৭ । ১৫	সাক্ষ্য	পাক্ষ্য [সাক্ষ্য]
৬৭ । ১৬	[অনিসন্ধিৎস]	[অনুসন্ধিৎসু]
৭২ । ০৩	স্বস্তিবচন	স্বস্তি-বচন
৮২ । ০১	Phone : By 637	Phone : Bz 637
৮২ । ০৭	এখণ্ডটিকে	এখণ্ডটিকেও
৯০ । ১৪	থাকে ।	থাক ।
১০০ । ১০	লেনকেত	লেনকে
১০২ । ১৩	প্রশান্ত	প্রশান্তচন্দ্র
১০৩ । ২৫	উদ্দেশ্যে	উদ্দেশ্য
১০৮ । ২৫	সাহিত্যিক ও অধ্যাপক	সাহিত্যিক, অধ্যাপক
১০৯ । ০৪	গ্রন্থে	'গ্রন্থে' শব্দটি বর্জিত হবে
১১২ । ১২	পথযোগে	পত্রযোগে
১১৪ । ০১	সে	যে
১১৭ । ১১	লিখেছিলেন	লিখেছেন
১১৯ । ২৪	"সবচেয়ে ক্ষতি-কারক	সবচেয়ে ক্ষতিকারক
১২০ । ০২	রবীন্দ্র-বিরোধিতা	রবীন্দ্রবিরোধিতা
১২০ । ০২	চালিয়েছিলেন।"	চালিয়েছিলেন।
১২৯ । ২১	কাজেই	কাজই
১৩০ । ০৮	নবেম্বর	নভেম্বর
১৩০ । ১৮	মাজিনে	মার্জিনে
১৩১ । ২৪	সংগ্রহে	সংগ্রহ
১৩৪ । ০৬	খ্যাতির বালিচাপা	খ্যাতির পথে বালিচাপা
১৩৬ । ০৫	রচিত	'রচিত' শব্দটি বর্জিত হবে
১৩৭ । ১১	সংখ্যায়	'সংখ্যায়' শব্দটি বর্জিত হবে
১৩৭ । ২৫	সজনীকান্ত	সজনীকান্তের
১৩৮ । ০৬	করিবে	করিবেন
১৪০ । ০৫	মাইকেল-বধ কাব্যে	মাইকেলবধ-কাব্যে
১৪১ । ১১	"ষষ্ঠ অধ্যায়ে"য়	"ষষ্ঠ অধ্যায়ে"

পৃ। ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৯। ০৯	'অলকার'র	'অলকা'র
১৫২। ১৫	ঢুকলো?	ঢুকলো?"।
১৫৩। ২২	সেটার	যেটার
১৬০। ১০	করি	কবি
১৬১। ০৯	দ্র	(দ্র
১৬৪। ০৩	ও	'ও' শব্দটি বর্জিত হবে
১৬৯। ১০	প্রদর্শনার	প্রদর্শনীর
১৬৯।	পাওয়ায়	পাওয়া
১৭৬। ১৫	কবি সকাশে	কবিসকাশে
১৭৭। ২০	কর।"	করা।"
১৭৮। ০৯	কুমারনরসিংহ	কুমার নরসিংহ
১৭৮। ১৩	অবচেতনের অবদান	অবচেতনার অবদান
১৭৯। ০৭	রথীন্দ্রনাথের	রবীন্দ্রনাথের
১৭৯। ২১	পরিবতন	পরিবর্তন
১৮১। ০৭	থেকে	থেকে।
১৯০। ২৮	প	পৃ.
১৯৩। ১১	বেলা	বেলা
১৯৪। ০৮	সংখ্যক	সংখ্যা
১৯৫। ২৬	কিশোরমোহন	কিশোরীমোহন
২০০। ১১	রাজা কুমারনরসিংহ দেবমল্ল।	রাজ কুমার নরসিংহ মল্লদেব
২০০। ২৬	ধরণের	ধরনের
২১৩। ০৯	আগ্রহায়ণ	অগ্রহায়ণ
২২১। ০৯	রবীন্দ্ররচনা	রবীন্দ্র-রচনা
২২৫। ০৭	সপ্তক পরবর্তী কবি	সপ্তকপারবর্তী কবি
২২৫। ১১	নাচন বাবাবু	নাচনবাবু
২৩০। ১৮	উমারাণী	উমারানী
২৩১। ২৩	রায় চৌধুরীর	রায়চৌধুরীর
২৩২। ০১	লিখেতেন	লিখতেন
২৩২। ১৪	একটু খানি	একটুখানি
২৩৩। ০৮	রিফিউজড়	"রিফ্রিউজড়"